সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ও সূচিপত্র	১
জিহাদের বিষয়ে কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ	২
জিহাদ সম্পর্কিত হাদীস সমূহ	৩
জিহাদ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী	৪
জিহাদ সম্পর্কে আহমদীয়াতের খলীফাগণের বাণী	৫-৮
১৬ই মার্চ, ২০১৯ অনুষ্ঠিত যুক্তরাজ্য জামাত দ্বারা আয়োজিত ১৬তম শান্তি সম্মেলনে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ	১১
ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ না করার কারণসমূহ *- মৌলানা জালালুদ্দীন শামস (রা.)*	১৬
জিহাদের ভ্রান্ত মতবাদের কুফল এবং প্রতিকারের উপায় *-শরীফ আহমদ কউসর, (শিক্ষক, জামিয়া আহমদীয়া)*	২১
রকুরআনের আলোকে জিহাদের তাৎপর্য *–নাসীর আহমদ আরিফ, ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া*	২৪
মহানবী (সা.)-এর আদর্শের আলোকে জিহাদের মর্মার্থ *-ফালাহুদ্দীন কমর, নাযারত উলিয়া, জুনুবী হিন্দ -*	২৭
‘ধর্মের নামে নরহত্যা’ পুস্তকের আলোকে মৌলানা মৌদুদির ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির অপনোদন *-মামুন রশীদ তাবরেজ, ইতিহাস বিভাগ*	৩০

সম্পাদকীয়

শান্তির বিশ্ব-দূত হযরত মির্যা মসরূর আহমদ জিন্দাবাদ

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ (আই.)এবছরের বিশেষ সংখ্যার জন্য ‘ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রচিত ‘আংরেজি গভর্ণমেন্ট অউর জিহাদ’ পুস্তকের আলোকে জিহাদের তাৎপর্য’ বিষয়ের মঞ্জুরী প্রদান করেছেন। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক এবং আনন্দের কারণ যে হুযুর আনোয়ার বিগত বছরগুলির ন্যায় এবছরও নিজের চরম ব্যস্ততা সত্ত্বেও পাঠকদের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বার্তা এবং স্বাক্ষরিত একটি ছবিও প্রেরণ করেছেন। আমরা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর এই স্নেহ-ভালবাসার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞ আর আন্তরিকভাবে এই দোয়া করি-

اَللّٰھُمَّ اَیِّدْ اِمَامَنَا بِرُوْحِ الْقُدُسِ وَبَارِكْ لَنَا فِیْ عُمُرِہٖ وَاَمْرِہٖ۔

জিহাদ তিন প্রকারের বলে বর্ণনা করা হয়। ১) জিহাদে আসগর অর্থাৎতরাবরীর জিহাদ।২) জিহাদে আকর অর্থাৎ আত্ম-শুদ্ধির জিহাদ। ৩) জিহাদে কবীর অর্থাৎ তবলীগের জিহাদ। জিহাদে আকবর অর্থাৎ সব থেকে বড় জিহাদ যাকে আত্মশুদ্ধির জিহাদ বলা হয়ে থাকে, এটি ছাড়া বাকি দুটি জিহাদের পথ সুগম হতে পারে না। যদিও বর্তমান যুগে জিহাদে আসগর অর্থাৎ সব থেকে ছোট জিহাদ স্থগিত রয়েছে, যেটি তরবারি ও বন্দুকের জিহাদ। তথাটি যখন এই জিহাদ বৈধ ছিল, অনুরূপভাবে জিহাদে আকবর অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের জিহাদ, এই উভয় প্রকারের জিহাদ সম্মানীয় সাহাবাগণ অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে পরিচালনা করেছেন, যার প্রধান কারণ হল এরা জিহাদে আকবরের অনন্য অশ্বারোহী ছিলেন। কাজেই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ হল আত্মাকে পবিত্র করার জিহাদ যা সর্বক্ষণ এবং সর্বাবস্থায় হতে পারে। এর পরের স্থান ইসলাম প্রচারের জিহাদ। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এই জিহাদটি সর্বাবস্থায় হতে পারে। তবে তরবারির জিহাদ এখন বন্ধ আছে, বিশেষ পরিস্থিতিতেই এটি বৈধ হতে পারে। এটি আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে এই যুগের ইমাম সৈয়্যদানা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীকে মান্য করার তৌফিক দান করেছেন। এই পুরস্কারের তুলনায় পৃথিবীর সকল পুরস্কার তুচ্ছ। এরই কল্যাণে আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে খিলাফতরূপী আশীর্বাদ দান করেছেন যার মাধ্যমে তিনি পৃথিবীর সম্মুখে ঐক্য ও সংহতির এক অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য প্রকাশ করেছেন। আমরা এমন এক অনবদ্য জামাত যারা এক অঙ্গুলি হেলনে উঠি ও বসি। এটি আমাদের জন্য গর্বের কারণ।

জামাত আহমদীয়া এই মুহূর্তে সমগ্র বিশ্বে জিহাদ কবীর অর্থাৎ ইসলাম প্রচারের জিহাদে সক্রিয় রয়েছে। একদিকে জামাত যেখানে ইসলামের চিত্তাকর্ষক শিক্ষাকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরছে, অপরদিকে ইসলামের প্রতি আরোপিত জিহাদের ভুল অর্থ ও ধারণাগুলিরও অপনোদন করছে। অর্থাৎ জামাত এই সত্য উদ্ঘাটন করে চলেছে যে, ইসলাম পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে পৌঁছেছে কেবল শান্তি ও ভালবাসার শিক্ষার কারণে, তরবারী আর বল প্রয়োগের মাধ্যমে নয়।

এখানে আমরা বিশেষভাবে একথাটি উল্লেখ করত চাই যে, ইসলামের সঠিক ভাবমূর্তি জগতবাসীর সামনে তুলে ধরতে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) গোটা বিশ্বে এক বিশেষ ও স্বতন্ত্র মর্যাদা অধিকার করে আছেন। তিনি বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে শত শত ভাষণ দিয়েছেন, যেগুলির মধ্যে একদিকে যেমন বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়েছেন, তেমনি অপরদিকে কুরআন, হাদীস এবং আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শ দ্বারা এও প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামই হল বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠার সব থেকে বড় ধ্বজবাহক, সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। পৃথিবীর সামনে ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে এবং ইসলামকে জিহাদ ও সন্ত্রাসের অন্যায় অপবাদ থেকে মুক্ত করতে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই বিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন পার্লামেন্ট এবং প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান সমূহে তিনি ভাষণ দান করেছেন। ২০০৭ সালের ২২ অক্টোবর তারিখে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দি হাউস অফ কমন, লন্ডনে ভাষণ প্রদান করেন। দ্বিতীয় বার এই পার্লামেন্টে তিনি ভাষণ দেন ২০১৩ সালে ১১ জুন তারিখে। ক্যাপিটাল হিলে ২৭ জুন ২০১২ তারিখে, জার্মানীর মিলিটারি হেড কোয়ার্টারে ৩০ শে মে ২০১২ তারিখে, বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অবস্থিত ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০১২, নিউজিল্যান্ডের পার্লামেন্টে ৪ঠা নভেম্বর ২০১৩ সালে, হল্যাণ্ডের ন্যাশনাল পার্লামেন্টে ৬ অক্টোবর ২০১৫ সালে, কানাডিয়ান পার্লামেন্টে ১৭ অক্টোবর ২০১৬ সালে। পৃথিবীর এই খ্যাতনামা ভবনগুলিতে ইসলামী শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসের কাজ। খোদার খলীফাই এই কাজ করতে পারেন।

সম্প্রতি ইউরোপ সফরে (ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড) তিনি ৮ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ফ্রান্সে ইউনেস্কো ভবনে দেওয়া ভাষণে ইসলামী শিক্ষামালা বর্ণনা করে বলেন, পৃথিবীতে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ইসলামের কিরূপ অসাধারণ অবদান রয়েছে। পাঠকবর্গকে জানিয়ে দিতে চাই যে, ইউনেস্কো রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি প্রতিষ্ঠান যা শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতির বিকাশের জন্য স্থাপিত হয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য কাজগুলির মধ্যে হল সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা, দারিদ্র দূরীকরণ এবং ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহের সংরক্ষণ করা।

২০১৯ সালে ২২ অক্টোবর তিনি জার্মানীর রাজধানী বার্লিনে ‘ইসলাম এন্ড ইউরোপ’ বিষয়ের উপর ভাষণ দেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ২৭ জন জাতীয় সাংসদের সদস্য, পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের প্রতিনিধিবর্গ, অধ্যাপকবর্গ, যুক্তরাষ্ট্র

এরপর ৩২-এর পাতায়

আল্লাহ্‌র পথে তোমরা ঐ সকল লোকের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু তোমরা সীমালঙ্ঘন করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

[মহান আল্লাহ্‌র বাণী]

আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদের আদেশ

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ

এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যথোচিতভাবে জিহাদ কর। (সুরা হজ্জ: ৭৯)

জিহাদের তাৎপর্য

۞ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

এবং যাহারা আমাদের (সাক্ষাতের) উদ্দেশ্য চেষ্টা-সাধনা করে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে আমাদের (নিকটে আসার) পথসমূহ প্রদর্শন করিব। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলগণের সঙ্গে আছেন।

(সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৭০)

জিহাদের প্রকারভেদ

۞ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا

অতএব তুমি কাফেরদর আনুগত্য করিও না, এবং তুমি ইহার (কুরআনের) সাহায্যে তাহাদের সহিত বৃহত্তর জিহাদ কর।

(সূরা ফুরকান, আয়াত: ৫৩)

জিহাদ বিল মাল বা ধন-সম্পদ দ্বারা জিহাদ

۞ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ (الانفال:73)

অনুবাদ: নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে, এবং হিজরত করিয়াছে, এবং নিজেদের জীবন ও ধন-সম্পদ দিয়া আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করিয়াছে এবং যাহারা (তাহাদিগকে) আশ্রয় দিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে- তাহারা একে অপরের বন্ধু।

(সূরা আনফাল, আয়াত: ৭৩)

ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় উপাসনাগারের সুরক্ষা

۞ اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ○ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○ (الحج:41-40)

অনুবাদ: অর্থাৎ যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে তাদেরকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হল কারণ তাদের উপর জুলুম করা হয়েছে এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি হইতে অন্যায়ভাবে শুধুমাত্র এই কারণে বহিষ্কার করা হয়েছে যে তারা বলে, আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক। আল্লাহ্ যদি এই সকল মানুষের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহা হইলে সাধু সন্ন্যাসীগণের মঠ, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদ সমূহ যাহাতে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয়, অবশ্যই ধ্বংস করে দেওয়া হত। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তার ধর্মের পথে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় শক্তিমান মহা পরাক্রমশালী। (সূরা হজ্জ, আয়াত: ৪০-৪১)

ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নাই

۞ لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ (البقرہ:257)

অনুবাদ: ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নাই। (কারণ) সৎপথ ও ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে (পুণ্যের পথে বাধাদানকারী বিদ্রোহী শক্তিকে) অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে সে নিশ্চয় এমন এক সুদৃঢ় হাতলকে মযবুত করিয়া ধরিয়াছে যাহা কখনও ভাঙ্গিবার নহে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫৭)

যাহার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যাহার ইচ্ছা অস্বীকার করুক

۞ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۫ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

এবং তুমি বল, ‘ এই সত্য তোমার প্রতিপালকের তরফ হইতে (প্রেরিত); সুতরাং যাহার ইচ্ছা ঈমান আনুক এবং যাহার ইচ্ছা অস্বীকার করুক। (সূরা কাহাফ, আয়াত: ৩০)

খোদার পথে জিহাদ কর আর কোনও প্রকার সীমালঙ্ঘন করো না

۞ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ (البقرہ:191)

অনুবাদ: এবং আল্লাহ্‌র পথে তোমরা ঐ সকল লোকের সহিত যুদ্ধ কর যাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু তোমরা সীমালঙ্ঘন করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদিগকে ভালবাসেন না।

(সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯১)

যুদ্ধে কোনও প্রকার সীমালঙ্ঘন করা বৈধ নয়

۞ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ؕ كَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ ○ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ (البقرہ:191-192)

এবং যেখানেই তোমরা তাহাদিগকে (অন্যায়ভাবে যুদ্ধকারীদিগকে) পাইবে হত্যা করিবে এবং তোমরাও তাহাদিগকে সেই স্থান হইতে বাহির করিয়া দিবে যেখান হইতে তাহারা তোমাদিগকে বাহির করিয়াছে, কেননা ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। এবং তোমরা মসজিদুল হারামের (মধ্যে এবং উহার) নিকটে তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে না-যে পর্যন্ত না তাহারা উহাতে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে। যদি তাহারা তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে তাহা হইলে তোমরা তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবে। ইহাই কাফেরদের সমুচিত প্রতিফল। অতঃপর, তাহারা যদি বিরত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

(সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯২-১৯৩)

ধর্মের উদ্দেশ্য ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা

۞ وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ؕ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ (البقرہ:194)

অনুবাদ: এবং তোমরা তাহাদের সহিত ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর যতক্ষণ পর্যন্ত না ফিৎনা দূরীভূত হয় এবং দীন আল্লাহ্‌রই জন্য (কায়েম) হয়। অতঃপর, যদি তাহারা নিবৃত্ত হয় তাহা হইলে (জানিও যে) কাহারও বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা নাই, কেবল যালেমদের ব্যাতিরেকে।

(সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৪)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেন-

এরপর ৫ পৃষ্ঠায়...

হে লোক সকল! শত্রুদের মোকাবিলা করার বাসনা রেখো না। আল্লাহ্ তা'লার নিকট মঙ্গল ও শান্তির দোয়া প্রার্থনা কর। কিন্তু যদি শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই হয়, তবে সেক্ষেত্রে ধৈর্য প্রদর্শন কর।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) কখনও কাউকে প্রহার করেন নি

۞ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهٖ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا اِلَّا اَنْ يُّجَاهِدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَيْئٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهٖ اِلَّا اَنْ يُنْتَهَكَ شَيْئٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ (مسلم، کتاب الفضائل، باب مباعدتہ للاثام واختیارہ من المباح)

অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) কখনও কাউকে প্রহার করেন নি, না কোনও মহিলাকে না সেবককে। তবে তিনি আল্লাহ্‌র পথে অনেক জিহাদ করেছেন। তাঁকে যখন কেউ কষ্ট দিয়েছে, কখনও তিনি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু যখন আল্লাহ্‌র নিকট সম্মানীয় কোনও স্থানের অসম্মান করা হয়েছে, তখন তিনি আল্লাহ্‌র কারণে প্রতিশোধ নিতেন।

কোন কর্মপন্থা আল্লাহ্‌র নিকট বেশি পছন্দনীয়।

۞ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَيُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللهِ تَعَالٰى ؟ قَالَ : اَلصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا : قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ : بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ : ثُمَّ اَيٌّ ؟ قَالَ : اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ۔
(بخاری، کتاب الجہاد، باب فضل الجہاد والسیر)

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি আঁহযরত (সা.)কে জিজ্ঞাসা করি যে, কোন কর্মপন্থা আল্লাহ্‌র নিকট বেশি পছন্দনীয়? তিনি উত্তর দিলেন, যথাসময়ে নামায পড়া। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এর কোন কাজটি? তিনি উত্তর দিলেন, পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করা। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, এরপর কোন কাজটি? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করা। অর্থাৎ খোদার ধর্মের প্রসারের উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ চেষ্টা করা।

(বুখারী কিতাবুল জিহাদ, বাব ফাযলুল জিহাদ)

মুশরিকদের বিরুদ্ধে নিজের ধন-সম্পদ, প্রাণ এবং জিহ্বা দ্বারা জিহাদ কর।

۞ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ۔

অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, 'মুশরিকদের বিরুদ্ধে নিজের ধন-সম্পদ, প্রাণ এবং জিহ্বা দ্বারা জিহাদ কর।'

(আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ,১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৯)

۞ عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْغَزْوُ غَزْوَانِ فَاَمَّا مَنِ ابْتَغٰى وَجْهَ اللهِ وَاَطَاعَ الْاِمَامَ وَاَنْفَقَ الْكَرِيْمَةَ وَيَاسَرَ الشَّرِيْكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَاِنَّ نَوْمَهٗ وَنَبْهَهٗ اَجْرٌ كُلُّهٗ وَاَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْاِمَامَ وَاَفْسَدَ فِي الْاَرْضِ فَاِنَّهٗ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ۔
(مؤطا امام مالک، کتاب الجہاد، الترغیب فی الجہاد، صفحہ 176)

অনুবাদ: হযরত মুআয (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন 'গাযওয়া' এবং জিহাদে দুই প্রকারের মানুষ অংশগ্রহণ করে থাকে। এক, যে ব্যক্তি খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জিহাদ করে, ইমামের আনুগত্য করে, নিজের উৎকৃষ্ট সম্পদ খোদার পথে খরচ করে, সঙ্গীর প্রতি নম্র আচরণ করে এবং বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা থেকে বিরত থাকে। এমন ব্যক্তির সর্বক্ষণ পুণ্য লাভ হতে থাকে, সে জাগ্রত থাকুক, কিম্বা নিদ্রিত। দ্বিতীয় প্রকারের ব্যক্তি খ্যাতি-সম্মান ও গর্বের উদ্দেশ্যে জিহাদে অংশগ্রহণ করে। সে ইমামের অবাধ্যতা করে। পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা ছড়ায়। এমন ব্যক্তি হতভাগ্য ও অকৃতকার্য, সে কিছুই অর্জন করতে পারবে না।

(মু'তা ইমাম মালিক, কিতাবুল জিহাদ, পৃ: ১৭৬)

শত্রুদের মোকাবিলা করার বাসনা রেখো না।

۞ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَوْفٰى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْضِ اَيَّامِهِ الَّتِيْ لَقِيَ فِيْهَا الْعَدُوَّ يَنْتَظِرُ حَتّٰى اِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيْهِمْ فَقَالَ : يَاَاَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَاسْاَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ ، فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا ، وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ ، وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اِهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ۔ (مسلم، کتاب الجہاد والسیر)

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আওফা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) একবার যখন শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তিনি সূর্য অস্ত যাওয়ার অপেক্ষা করলেন। অতঃপর উঠে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিলেন: হে লোক সকল! শত্রুদের মোকাবিলা করার বাসনা রেখো না। আল্লাহ্ তা'লার নিকট মঙ্গল ও শান্তির দোয়া প্রার্থনা কর। কিন্তু যদি শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই হয়, তবে সেক্ষেত্রে ধৈর্য প্রদর্শন কর। আর একথা জেনে রেখো যে জান্নাত তরবারির ছায়া তলে। অতঃপর রসুলুল্লাহ্ (সা.) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ্! তুমি কিতাব অবতরণকারী, মেঘমালাকে গতি দানকারী, শত্রুদের দলকে পরাস্তকারী। তুমি এই শত্রুদেরকে পরাজিত কর আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

(মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সির)

সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল অত্যাচারী বাদশাহর সামনে ন্যায় বিচারের দাবি করা

۞ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِالْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ۔ (ترمذی۔ کتاب الفتن)

অনুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, 'আঁহযরত (সা.) বলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল অত্যাচারী বাদশাহর সামনে ন্যায় বিচারের দাবি করা।

(তিরমিযি, কিতাবুল ফিতন)

۞ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِيْ اُمَّةٍ قَبْلِيْ اِلَّا كَانَ لَهٗ مِنْ اُمَّتِهٖ حَوَارِيُّوْنَ وَاَصْحَابٌ يَاْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهٖ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لَا يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهٖ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَآءَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ۔ (مسلم، کتاب الایمان)

অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসুদ (রা.) বর্ণনা করেন, রসুলুললাহ্ (সা.) বলেছেন," আমার পূর্বে আল্লাহ্ তা যে সব নবীদের প্রেরণ করেছেন তাদেরকে কিছু এমন নিষ্ঠাবান সঙ্গী দেওয়া হয়েছে যারা তাঁর কর্মপদ্ধতি মেনে চলত এবং তাঁদের পূর্ণ আনুগত্য করত। অতঃপর তাদের মৃত্যুর পশ্চাতে কিছু এমন সব অযোগ্য ব্যক্তিরা জন্ম নিল যারা যা কিছু বলত তা নিজেরা মেনে চলত না, আর এমন কাজ করত যার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়নি। অতএব যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে

এরপর ৫-এর পাতায়.....

এ আপত্তি বা অভিযোগ যে ইসলাম নাকি জোর-জবরদস্তির ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে তলোয়ার ধারণ করেছিল তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও লজ্জাকর অপবাদ। এটা কেবল সে সব লোকের অলীক ধারণা যারা নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে কুরআন ও হাদী এবং ইসলামের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাঠ করে নি, বরং পুরোপুরি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ইসলামের বিরদ্ধে ভ্রান্ত অপবাদ দিয়েছে।

ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম -এর পবিত্র বাণী

ইসলাম কখনও বল প্রয়োগের শিক্ষা দেয় নি। কুরআন করীম, হাদীস ও ইতিহাসের সব গ্রন্থে যদি গভীর দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং যথা সম্ভব গভীর মনোনিবেশে তা অধ্যয়ন বা শ্রবণ করা হয়, তাহলে এভাবে সঞ্চিত এই ব্যপক তত্ত্ব-তথ্যের ভিত্তিতে সন্দেহাতীতভাবে জানা যাবে, এ আপত্তি বা অভিযোগ যে ইসলাম নাকি জোর-জবরদস্তির ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে তলোয়ার ধারণ করেছিল তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও লজ্জাকর অপবাদ। এটা কেবল সে সব লোকের অলীক ধারণা যারা নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে কুরআন ও হাদী এবং ইসলামের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস পাঠ করে নি, বরং পুরোপুরি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ইসলামের বিরদ্ধে ভ্রান্ত অপবাদ দিয়েছে। কিন্তু আমি জানি সে যুগ এখন ঘনিয়ে আসছে যখন সত্যের জন্য ক্ষুধার্থ ও পিপাসার্ত মানুস এসব অপবাদের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হবে। আমরা কি সে ধর্মকে বল প্রয়োগের ধর্ম নামে অবহিত করতে পারি, যার কিতাব কুরআন করীমমে সুস্পষ্টভাবে এ নিদর্শন রয়েছে- 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন; অর্থৎ ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য কোন জোর-জবরদস্তি বৈধ নয়?' আমরা কি সেই মহমিান্বিত নবীকে বলপ্রয়োগের এ অপবাদ দিতে পারি, যিনি মক্কা মুয়ায্যামায় তেরটি বছর ধরে তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে রাত দিন কেবল এ উপদেশই দিতে থাকেন, 'শত্রুর অনিষ্টের জবাব অনিষ্টের দ্বারা দিতে যেও না, বরং ধৈর্য ধর।' তবে যখন শত্রুর অনিষ্টের সীমা ছাড়িয়ে গেল এবং ইসলাম ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য সকল জাতি তৎপর হল, তখন ঐশী আত্মমর্যাদাবোধ মনস্থ করলো, যারা তলোয়ার ধারণ করে তাদেরকে যেন তলোয়ার দিয়েই হত্যা করা হয়। নচেৎ কুরআন করীম কক্ষণও জবরদস্তি করার শিক্ষা দেয় নি। যদি জবরদস্তি করার শিক্ষা থকতো তাহলে আমাদের নবী (সা.)-এর সাহাবগণ জবর-দস্তির শিক্ষার কারণে পরীক্ষার ক্ষেত্রে খাঁটি ঈমানদারের ন্যায় নিষ্ঠা প্রদর্শনের পরিচয় তুলে ধরতে পারতেন না। কিন্তু আমাদের প্রভু ও অভিভাবক নবী (সা.)-এর সাহাবাগণের বিশ্বস্ততা প্রদর্শন এমন এক বিষয়, যা বর্ণনা করাও দরকার বলে মনে করি না। এ বিষয়টি কারোও কাছে অবিদিত নয়, তাদের পক্ষ থেকে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার এমন পর্যায়ের নমুনা ও দৃষ্টান্তের বহির্প্রকাশ ঘটেছে যার নজির অন্যান্য জাতির মাঝে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বিশ্বস্ততার পরাকাষ্ঠা এ দলটি তরবারির ছায়ার নীচেও নিজেদের বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠাকে কখনও বর্জন করেন নি, বরং সর্বদা তাদের পবিত্র ও মহান নবীর সাহচর্যে তারা সেই নিষ্ঠা দেখিয়েছেন যা মানুষের অন্তর ঈমানের আলোকে আলোকিত না হওয়া পর্যন্ত কখনও দেখাতে পারে না। মোট কথা, ইসলামে কোন বল-প্রয়োগের বিধান নেই। ইসলামের যুদ্ধসমূহ তিন প্রকারের, এর বাইরে নয়।

১) প্রতিরোধস্বরূপ, অর্থাৎ আত্মরক্ষামূলক অধিকারের ধারায়

২) শাস্তিস্বরূপ,অর্থাৎ রক্তের বিনিময়ে রক্ত ও

৩) স্বাধীনতা সংস্থাপন স্বরূপ, অর্থাৎ বল-প্রয়োগকারীদের পাশবিক শক্তিকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে, যারা কারও স্বেচ্ছায় মুসলমান হওয়াতে তাকে হত্যা করত। অতএব যেখানে ইসলামে কোন নির্দেশ নেই যে, কোন ব্যক্তিকে জবরদস্তি ও হত্যার হুমকির দ্বারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা যায়, সেখানে কোনও রক্তপাতকারী মাহদী অথবা রক্তক্ষরণকারী কোনও মসীহর আগমণের জন্য অপেক্ষা করা নিতান্ত বাতুলতা এবং বেহুদা ধারণা বৈ কিছুই নয়। কেননা সম্ভবই নয় যে, কুরআনী শিক্ষার বিরুদ্ধাচারণে এমন কোনও মহাপুরুষ আসবেন যিনি তলোয়ারের মাধ্যমে মানুষকে মুসলমান করেন। এ বিষয়টি মোটেই এমন কঠিন বিষয় নয়, যা বুঝতে কারও অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু নির্বোধ লোকদেরকে প্রবৃত্তির লোভ-লালসা এ বিশ্বাসের দিকে ধাবিত করে। কেননা আমাদের অধিকাংশ মৌলবী আত্মপ্রতারণার দরুন মনে করেন যে, মাহদীর যুদ্ধগুলোর মাধ্যমে তারা এ ধন-সম্পদ পাবেন যা তারা অবশেষে সামাল দিতে পারবেন না।

যেহেতু এ দেশের অধিকাংশ মৌলবী অতি দারিদ্র-ক্লিষ্ট, সে কারণেও তারা অধীর আগ্রহে এরূপ মাহদীর জন্য এ আশায় অপেক্ষমান যে, হয়ত এ উপায়েই তাদের প্রবৃত্তির প্রয়োজন মিটবে। অতএব যে ব্যক্তি এরূপ মাহদীর আগমণকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করে, এরা তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। তাকে তৎক্ষণাৎ কাফির আখ্যা দেয়। ফলে সে ইসলামের গণ্ডী বহির্ভুত বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং আমিও এসব কারণেই এ লোকদের দৃষ্টিতে কাফির; কেননা আমি এহেন খুনি মাহদী ও খুনী মসীহের আগমণে বিশ্বাস করি না। বরং এ সব বাজে বিশ্বাসকে অত্যন্ত অপছন্দ করি ও ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখি। তবে তারা যে কল্পিত মাহদী ও কল্পিত মসীহ্র আগমণের বিশ্বাসী, কেবল তাকে অস্বীকার কারণেই আমাকে কাফির ঘোষণা করা হয় নি, বরং এ কারণেও করা হয় যে, আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে ইলহাম (ঐশীবাণী) প্রাপ্ত হয়ে তাঁরই আদেশে সবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছি যে, সেই প্রতিশ্রুত প্রকৃত মসীহ আমিই, যিনি প্রকৃতপক্ষে মাহদীও হবেন। তাঁর আগমণের সুসংবাদ ইঞ্জিল ও কুরআনে বিদ্যমান এবং হাদীসও যার আগমণ সম্পর্কে ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। তাকে অবশ্যই কোন তলোয়ার বা বন্দুক দেওয়া হয় নি। খোদা তা'লা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি নম্রতা, বিনয় ও সহিষ্ণুতার সাথে সেই আল্লাহ্র দিকে মানুষকে আহ্বান করি, যিনি সত্য খোদা, যিনি আদি, অনন্ত ও অপরিবর্তনীয়, যিনি পরিপূর্ণ পবিত্রতা, পরিপূর্ণ জ্ঞান, পরিপূর্ণ কৃপা ও পরিপূর্ণ ন্যায়পরায়ণতার অধিকারী।

(মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫,পৃ: ১১)

একজন রক্তপাতকারী ইমাম মাহদী ও রক্তক্ষরণকারী মসীহ (-এর আগমণ) সম্পর্কে আহলে হাদীস ফির্কাসহ (যাদেরকে ওহাবীও বলা হয়) কিছু সংখ্যক অন্যান্য ফিরকার মুসলমানদের অন্তরে বদ্ধমূল এসব বিশ্বাস তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক অবস্থার ওপর অত্যন্ত মন্দ প্রভাব ফেলছে-এত বেশি মন্দ প্রভাব যে, এর কারণে তারা যেমন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী জাতির মাঝে সচ্চেতনা ও সততার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বাস করতে পারে না, তেমনি কোন ভিন্ন সরকারের অধীনেও সত্যিকার আনুগত্য ও পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে বসবাস করতে পারে না। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি এত কঠিন বলপ্রয়োগের বিশ্বাস যে, তাদেরকে হয়তো তখন তখনই মুসলমান হতে হবে, নইলে তাদেরকে হত্যা করা হবে এমন ধর্মবিশ্বাস যে নিতান্তই আপত্তিকর তা বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই বুঝতে পারেন। প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই অনায়াসে স্বীকার করবেন, কারও কোনও ধর্মের সত্যাসত্য যাচাই ও এর শিক্ষার সত্যতা

উপলব্ধি করার এবং এর কল্যাণ ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার পূর্বেই কোন ব্যক্তিকে কেবল জোর-জবরদস্তি ও হত্যার হুমকির মাধ্যমে নিজ ধর্মে দীক্ষিত করা অত্যন্ত অপছন্দনীয় পন্থা।এরূপ পন্থায় ধর্মের উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা বরং উল্টো এর প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে আপত্তি করার সুযোগ করার দেওয়া হয়। এমন রীতি-নীতির শেষ পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, মানবজাতির প্রতি সহানুভুতি অন্তর থেকে সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়। মানবতার মৌলিক চারিত্রিক গুণ দয়া, মায়া ও ন্যায়বিচার সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়, আর এর পরিবর্তে হিংসা-বিদ্বেষ ও অহিত সাধন স্পৃহা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কেবল হিংস্রতা অবশিষ্ট থেকে যায় এবং উচ্চ চারিত্রিক গুণাবলীর চিহ্ন পর্যন্ত মুছে যায়। কিন্তু সুস্পষ্ট যে, ঐরূপ রীতি-নীতি সেই খোদা তা'লার পক্ষ থেকে (গণ্য) হতে পারে না, যাঁর প্রত্যেক শাস্তি কেবল চূড়ান্তভাবে যুক্তি প্রতিষ্ঠার পরেই হয়ে থাকে।

(মসীহ হিন্দুস্তান মেঁ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫,পৃ: ৭)

বর্তমান যুগে জিহাদ

আরও একটি বিষয় হল সেই প্রথম নমুনার ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয়ও দৃষ্টিপটে রাখা ছিল। অর্থাৎ সেই সময় বীরত্ব প্রদর্শনও উদ্দিষ্ট ছিল যা তৎকালীন যুগে সব থেকে প্রশংসিত ও ঈর্ষণীয় গুণ হিসেবে বিবেচিত হত। কিন্তু বর্তমান যুগে যুদ্ধ বড় কলাকৌশল ও প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছে, যেখানে দূরে বসে থাকা ব্যক্তিও তোপ ও বন্দুক চালনা করতে সক্ষম। সেই যুগে প্রকৃত যোদ্ধা সেই ছিল যে তরবারির সামনে বুক চিতিয়ে লড়াই করার স্পর্ধা রাখত।

বর্তমান যুগের রণকৌশলকে কাপুরুষদের মুখোশ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? এখন বীরত্ব অপ্রাসঙ্গিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, বরং যার কাছে তোপ, বন্দুক ইত্যাদি অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র আছে আর সে সেগুলি চালনা করতেও সক্ষম, সে সফল হবে। সেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল মোমেনদের সুপ্ত বীরত্বকে প্রকাশ করা। খোদা তা'লার অভিপ্রায় অনুসারেই সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে আর এখন এর প্রয়োজন ফুরিয়েছে, কেননা যুদ্ধ এখন রণকৌশল ও নীতির রূপ ধারণ করেছে। অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র ও জটিল প্রযুক্তি মূল্যবান ও প্রশংসাযোগ্য এই গুণটিকে ধূলি ধূসরিত করেছে। ইসলামের উন্মেষলগ্নে প্রতিরক্ষামূলক ও বাহ্যিক যুদ্ধাবলীর প্রয়োজন একারণেও দেখা দিয়েছিল যে, সেই যুগে ইসলামের প্রতি আহ্বানকারীদেরকে যুক্তি-প্রমাণের পরিবর্তে তরবারির মাধ্যমে উত্তর দেওয়া হত। এই কারণেই নিরুপায় হয়ে তরবারির জবাবে তরবারি ধারণ করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। কিন্তু এখন তরবারি দ্বারা জবাব দেওয়া হয় না, বরং লেখনী এবং যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামের সমালোচনা করা হয়। অতএব, খোদা তা'লার অভিপ্রায়, এই যুগে তরবারি কাজ যেন কলমের মাধ্যমে করা হয় আর লেখনীর মাধ্যমে বিরুদ্ধবাদীদের পর্যদুস্ত করা হয়। কাজেই, কলমের জবাব তরবারির মাধ্যমে দেওয়ার চেষ্টা করা গর্হিত কাজ।

ফার্সি পঙক্তি: যদি তুমি নিজের মর্যদা সম্পর্কে সচেতন না হও, তবে নিজের বিশ্বাস হারিয়ে বসবে।

বর্তমান যুগে কলমের প্রয়োজন

অবশ্যই জেনে রেখো! বর্তমান যুগে প্রয়োজন কলমের, তরবারির নয়। আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহ তৈরী করেছে আর বিভিন্ন কৌশল ও জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহ্ তা'লা প্রেরিত এই সত্য ধর্মের উপর আক্রমণ করেছে। এই কারণেই তিনি আমাকে এদিকে আকৃষ্ট করেছেন যেন, আমি কলমের অস্ত্র ধারণ করে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ি আর ইসলামের আধ্যাত্মিক বীরত্ব ও শক্তির নিদর্শন দেখাই। আমি কবেই বা এই ময়দানের যোগ্য হতে পারতাম? এটি তো কেবল খোদা তা'লার কৃপা, যিনি আমার মত দূর্বল ব্যক্তির হাতে এই ধর্মের সম্মান প্রকাশ করতে চান। আমি একবার বিরুদ্ধবাদীদের ইসলামের উপর করা এই সব অভিযোগ ও আক্রমণগুলি গণনা করেছিলাম। সেই সময় আমার কাছে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল আনুমানিক তিন হাজার। আমার ধারণা, এই সংখ্যা বর্তমানে অতিক্রম করে গেছে। কেউ যেন একথা মনে না করে বসে যে, ইসলাম এমন দুর্বল ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে যার উপর তিন হাজার অভিযোগ করা যায়। না, কখনই এমনটি না। এই অভিযোগগুলি কেবল নির্বোধ ও অজ্ঞদের কাছে আপত্তিজনক হতে পারে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে সত্য সত্য বলছি, আমি যেখানে এই অভিযোগগুলি গণনা করে দেখেছি, সেখানে এবিষয়টিও লক্ষ্য করেছি যে, বস্তুত এই আপত্তিগুলির গভীরে অত্যন্ত মূল্যবান সত্য লুকিয়ে আছে যা তাদের ক্ষীণ দৃষ্টিতে ধরা দেয় নি। বস্তুত, দৃষ্টিহীন নিন্দুকরা যেখানে এসে থেমে যায়, ঠিক সেখানেই মারেফ ও তত্ত্বজ্ঞানের ভান্ডার লুক্কায়িত আছে। এটিই খোদা তা'লার প্রজ্ঞা।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯-৫১)

****

২পাতার শেষাংশ....

'ওয়া কাতেলুহুম'-শব্দবন্ধনে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ রয়েছে যারা মানুষকে ধর্মচ্যুত হতে বাধ্য করে। কাজেই যারা তরবারির জোরে ধর্মচ্যুত হতে বাধ্য করে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ বৈধ, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিবৃত্ত হয়।

যুদ্ধে শত্রুদের প্রতিও ন্যায় করা আবশ্যক

۞ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدہ:9)

অনুবাদ: হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ন্যায়পরায়ণতার উপর সাক্ষী হিসাবে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হও, এবং কোন জাতির শত্রুতা যেন তোমাদিগকে এই অপরাধ করিতে আদৌ প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ন্যায়বিচার না কর। তোমরা সুবিচার কর, ইহা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, নিশ্চয় তোমরা যে কাজ-কর্ম করিতেছ উহা সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। (সূরা মায়েদা, আয়াত:৯)

****

৩ পাতার শেষাংশ....

হাত দ্বারা জিহাদ করে সে সঠিক মোমিন। যে তাদের বিরুদ্ধে জিহ্বা (কথা) দ্বারা জিহাদ করে সেও মোমিন আর যে তাদের বিরুদ্ধে মনে মনে জিহাদ করে অর্থাৎ মনে মনে অপছন্দ করে সেও মোমিন। এর পর ঈমানের বিন্দুমাত্র অংশও অবশিষ্ট থাকে না।

(মুসলিম কিতাবুল ঈমান)

۞ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنَّمَا تَرْمُونَهُمْ بِهِ نَضْحَ النَّبْلِ. (مشکوۃ، باب البیان والشعر)

অনুবাদ: হযরত কাআব বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি নবী করীম (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করি যে, হুযুর! আল্লাহ্ তা'লা কবি ও কবিতা সম্পর্কে যা কিছু নাযেল করেছেন, তা সম্পর্কে হুযুর (সা.) নিশ্চয় অবগত আছেন। (তাই আমি কিভাবে কবিতা ও ছন্দের মাধ্যমে কুফফারদেরকে বিদ্রুপ করতে পারি?) একথা শুনে আঁহযরত (সা.) বললেন, মোমেন কখনও তরবারি দ্বারা জিহাদ করে, কখনও জিহ্বা দ্বারা। সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ রক্ষিত আছে! সেই সময় তুমি (বিদ্রুপাত্মক কবিতার মাধ্যমে) যেন প্রকারান্তে তীর দ্বারা তাদেরকে ক্ষতবিক্ষত করবে।

(মিশকাত, বাবুল বায়ান ওয়াশ শের)

জিহাদ সেই সময় বৈধ, যখন মোমেন কুফফারদের নৈরাজ্যে থাকে না, আর যারা ঈমান এনেছে তারা নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে ইবাদত করতে পারে।

(হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর বাণী)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) সূরা বাকারার ১৯৪ নং আয়াতের ব্যাখায় লেখেন-

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ এবিষয়টি ভালভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে আল্লাহ্ তা'লা ধর্মকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চান না, বরং কুরআন শরীফে লেখা আছে, তিনি চাইলে সমগ্র জগতকে এক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করে দিতেন। فَلَوْ شَآءَ لَهَدٰىكُمْ اَجْمَعِيْنَ (আল আনআম, আয়াত: ১৫০) অন্যত্র তিনি বলেছেন, لَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ (আল হজ্জ, আয়াত: ৪১) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা যদি মানুষকে একে অন্যের মাধ্যমে রক্ষা না করতেন, তবে খৃষ্টান, মুসলমান, নক্ষত্র উপাসক, ইহুদী- সকলের উপাসনাগার ধরাশায়ী হত। যা থেকে বোঝা যায় যে, ধর্মের মধ্যে ভেদাভেদ রাখা আল্লাহ্র অভিপ্রায় নয়। আল্লাহ্ তা'লা আম্বিয়াগণকে একমাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে থাকেন। মানুষকে জোর করে ধরে মুসলমান বানানো উদ্দেশ্য নয়, বরং তাঁরা لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ (আল বাকারা, আয়াত: ২৫৭) এর অধীনে চলেন। কেননা, মানুষ খোদার নিকট মোমেন হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আন্তরিকভাবে ঈমান আনে। আর সেই ঈমানের প্রভাব তার বাহ্যিক আচার-আচরণে প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যক, কেউ যেন সেগুলির মধ্যে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে।

অতএব, জিহাদ সেই সময় বৈধ, যখন মোমেন কুফফারদের নৈরাজ্যে থাকে না, আর যারা ঈমান এনেছে তারা নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে ইবাদত করতে পারে। তারা কপটতা প্রদর্শনে বাধ্য থাকে না, বরং يَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ তাদের ধর্ম আল্লাহ্র জন্য হবে, কোনও বিশৃঙ্খলা থাকবে না।

(হাকায়েকুল ফুরকান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩২৭)

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ

সূরাতুল হজ্জের ৩৯-৪০ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন-

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) বলেন: اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেকটি জিনিসের সীমা নির্ধারণ করে রেখেছেন। কোনও জিনিস যখন এই সীমা লঙ্ঘন করতে থাকে, তখন তার প্রতিরক্ষার জন্য কোনও জিনিস তৈরী করে দেন। কুফর বেড়ে যাওয়ায় তিনি হযরত মহম্মদ (সা.) ও তাঁর জামাতকে তৈরী করলেন। কেননা, কুফর পছন্দ করেন না। কোনও এক মসীহ এসে সমস্ত মানুষকে মুসলমান বানিয়ে ফেলবেন- এমন ধারণা অনর্থক। তিনি কি হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর থেকে বেশি পবিত্রকরণ শক্তির অধিকারী হবেন? তিনি কি কুরআন শরীফের থেকে উন্নততর কোন কিতাব আনবেন? আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেকটি বস্তুকে একটি সীমার মধ্যে রাখতে চান।

তিনি আরও বলেন,

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ

অনুবাদ: তাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হল, কেনন তাদেরকে অত্যাচার করা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সাহায্য করার শক্তি রাখেন। (সূরা হজ্জ-৪০)

ইসলামের খোদা উভয় প্রকারের জয় প্রদর্শন করতে চান। এমনও সময় ছিল যখন শত্রুরা ইসলামকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে তরবারি ধারণ করেছিল। মুসলমানদেরকে হত্যা করতে আরম্ভ করা হলে ইসলাম মুসলমানদেরকে যুদ্ধ ও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করতে নিষেধ করে। ইসলাম তাদেরকে সেই দেশ থেকে দেশান্তরিত হওয়ার নির্দেশ দেয়, যেখানে দুঃখ-কষ্ট রয়েছে। এই কারণেই পবিত্র মক্কা ত্যাগ করা হয়। শত্রুরা এতেও ক্ষান্ত হল না, মুসলমানদের পিছু ধাওয়া করল। তখন ইসলাম তরবারী ধারণ করল এবং সফল হল।

অতঃপর এই যুগে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীতে (হিজরী) যুক্তি-প্রমাণের অস্ত্র দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ইসলামের কারণে কোনও জাতি কোনও মুসলমানের উপর অস্ত্র ধারণ করে না। কাজেই ইসলামও অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা একে প্রতিহত করতে শুরু করেছে।

পৌত্তলিক জাতিগুলি ইসলামের সামনে পরাস্ত হয়ে পৌত্তলিকতার দাবি থেকে বিরত হচ্ছে। আর এ বিষয়ে যে চুক্তিও হচ্ছে। কেননা, ভারতে এদের কিছু অংশ ব্রহ্মবাদী হয়েছে, কেউ আর্যসমাজী হয়েছে। অপরদিকে ইউরোপ ও আমেরিকায় ইউনিটেরিয়ান ও স্বাধীন চিন্তকদের এক জন-সমুদ্র তৈরী হয়েছে, যা অভুতপূর্ব । হযরত মসীহ-এর ঈশ্বরত্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে। ..... মানুষ পবিত্র ইসলাম ধর্মের আলিঙ্গনে আসছে।

পৃথিবীতে যে সমস্ত পুণ্য রয়েছে, সেগুলির সঙ্গে কিছু সমস্যাও রয়েছে। সুখের সঙ্গে দুঃখ আর দুঃখের সঙ্গে সুখ রয়েছে। শেষোক্ত উপমাটি প্রসব-বেদনার পর পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার।

সাহাবাগণ মক্কায় ভীষণ কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করেছেন। (১) অনেকের পা দুটিকে দুটি উটের সঙ্গে বেঁধে উট দুটিকে বিপরীত দিকে চালিত করে তাদের শরীর চিরে ফেলা হত। ২) কিছু মহিলার জননাঙ্গে বর্শা প্রবেশ করে কণ্ঠ দিয়ে বের করা হয়েছে। (৩) বনু হাশিমদের কাছে তিন বছর পর্যন্ত খাদ্য–শস্য পৌঁছতে বাধা সৃষ্টি করা হয়েছে। ৪) তাদের মধ্যে কিছু সাহাবাকে উত্তপ্ত পাথর খণ্ডের উপর শুইয়ে রাখা হত। কিন্তু তারা অত্যন্ত ধৈর্য, অবিচলতা এবং সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে সেই সব যাতনা সহ্য করেছেন।

মহররমে ইমাম হোসেন (রা.)-এর কষ্টের কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু সাহাবাগণ যে দুঃখ-যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, অনেক সময় সেই যন্ত্রণা অনেক বেশি ছিল। এই ধৈর্যের প্রতিদানেই জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। একথা সঠিক নয় যে তিনি কোনও বড় সেনা দল গঠন করা পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন। لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ (নিসা, আয়াত: ৮৫)-এর আদেশ এবং হুনাইনের যুদ্ধে তাদের পশ্চাদপসরণ এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়। অতএব, ইসলাম তরবারীর জোরে প্রসার লাভ করেছে, একথা মিথ্যা।

ইসলামের আরও একটি অনুগ্রহ রয়েছে, যা আমার মতে পৃথিবীর আর কোনও সংস্কারকের মাথায় আসে নি।

اِنَّ اللّٰهَ يُدٰفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ
لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا

অনেক সময় আত্মরক্ষার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, এটি না হলে গীর্জাঘরগুলি ধ্বংস হয়ে যেত। ধর্মশালা এবং ইহুদীদের উপাসনাগারগুলি ধ্বংস হয়ে যেত, আর আমরা চাই না এগুলি ধ্বংস হোক। এই সোনালী নীতি পৃথিবীর অন্য কোনও ধর্মীয় গ্রন্থে পাওয়া যায় কি? যদি এই বাক্যটি ইঞ্জিলে থাকত, তবে খৃষ্টানরা বিরোধীদের প্রতি যে আচরণ করেছিল তা করত না। মিথোলোজি পাঠ করলে জানতে পারবে যে, খৃষ্টানদের পূর্বে আরও কত উপাসনাগার ছিল, যেগুলির আজ নাম চিহ্ন পর্যন্ত অবশিষ্ট নেই। যেমন পাড়ামোর প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল যেখানে সিকান্দর তীর্থে এসেছিলেন। কিন্তু সেই মন্দির কোথায় ছিল তা আজ কেউ বলতে পারবে না।

শেষাংশ ৩৫ পাতায়

ঐশী বাণীর সাহায্যে মানুষকে ধর্মের দিকে আহ্বান কর। কুরআন করীমই আমাদের একমাত্র অস্ত্র। এই কুরআনের তরবারী নিয়ে পৃথিবীতে জিহাদের জন্য বের হও

(হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর বাণী)

কুরআন করীমই আমাদের অস্ত্র

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-

নবুয়্যতের অর্থের প্রেক্ষিতে এর অর্থ হবে ঐশী বাণীর সাহায্যে মানুষকে ধর্মের দিকে আহ্বান কর। সেই দলিলগুলিই পেশ কর যেগুলি কুরআন করীম স্বয়ং উপস্থাপন করেছে, নিজের পক্ষ থেকে অসার যুক্তি উপস্থাপন করবে না। মুসলমানেরা যদি এই পরামর্শটি যদি া মেনে চলত! তবে আজ খৃষ্টবাদ ও ইহুদী ধর্মকে নির্মূল করে দিত। কুরআন করীমই আমাদের একমাত্র অস্ত্র, যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন- وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ (ফুরকান-৫) এই কুরআনের তরবারী নিয়ে পৃথিবীতে জিহাদের জন্য বের হও। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল আজ মুসলমানদের হাতে সব কিছুই আছে, নেই শুধু সেই তরবারিখানি যেটি হাতে নিয়ে বের হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

(তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৭৩)

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ আয়াতে জিহাদের বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا আয়াতটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-

দেখ এখানে জিহাদ সম্পর্কে কিরূপ স্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর সেই মহান দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন করা হয়েছে যা জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বর্তমান যুগে জিহাদ সম্পর্কে উপস্থাপন করেছেন।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, এমন যুগ আসতে চলেছে যখন মুসলমানদের একটি অংশ বলবে কুফফারদের সঙ্গে জিহাদ করে এবং তাদেরকে তরবারির জোরে ধ্বংস করার চেষ্টার মাধ্যমেই এখন ইসলামের প্রসার হতে পারে। কিন্তু তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত চিন্তাধারার ফসল। সঠিক পন্থা হবে তাদের বিরুদ্ধে ত্বরাপরায়ণতা প্রদর্শন না করা, তাদের আক্রমণকে ধৈর্যের সাথে সহন করা এবং কেবল আধ্যাত্মিক উপায় অবলম্বন করা অর্থাৎ ইসলামের তবলীগ এবং দোয়া করা ইত্যাদি পন্থা অবলম্বন করা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যিনি খোদার পক্ষ থেকে পৃথিবীর সংশোধনের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি মানুষের সামনে এই ঘোষণা করেন-

এই ঘোষণা শোনার পরও যে যুদ্ধে যাবে, সে কাফেরদের বিরুদ্ধে জঘন্যভাবে পর্যদুস্ত হবে।

তিনি বলেন, যখন মুসলমানদের কাছে কোনও প্রকার শক্তিই নেই, তখন তাদের জন্য তরবারির জিহাদ কিভাবে অনিবার্য হতে পারে। সেই সময় আসবে আর আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে চাইবেন মুসলমানদেরকে তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রদান করবেন। যাইহোক তিনি মুসলমানদের সে যুগের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার প্রত্যাখ্যান করেছেন। لَا تَعْجَلْ আয়াতে এই সত্যই বর্ণিত হয়েছে।

প্রকৃত বিষয় হল এই সূরায় খৃষ্টানদের যে উন্নতির কথা বলা হয়েছে তা ছিল ভবিষ্যতের জন্য। হাদীস ও কুরআনে এটিকে শেষ যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখা হয়েছে। কাজেই, 'লা-তা'জাল' বলতে রসূল করীম (সা.)-এর সত্তাকে বোঝানো হয় নি, বরং পরবর্তীকালে মুসলমানদেরকে বোঝানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে এক সময় আসবে যখন খৃষ্টানদের উন্নতি দেখে মুসলমানেরা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠবে। তাই এটি আশ্চর্যের বিষয়, যে যুগে খৃষ্টধর্মের উপর মুসলমানদের আধিপত্য ছিল, তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার শক্তি রাখত, সেই সময় পর্যন্ত মুসলমানেরা তাদের সম্পর্কে উদাসীন ছিল। কিন্তু যখন খৃষ্টবাদ পৃথিবীতে প্রসার লাভ করল, তখন তারা জিহাদ নিয়ে চিন্তিত হল। সেই সময় খোদার অভিপ্রায় نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। এটা জানার পর মুসলমানদের উচিত ছিল পূর্বের উদাসীনতা নিয়ে অনুতপ্ত হওয়া এবং তাদের ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দোয়া করা। আর পূর্বের অবেহলার সংশোধন হয়ে কুরআন করীমের কল্যাণে খৃষ্টবাদের দাপট যেন খর্ব হয় সেই উদ্দেশে তাদের উচিত ছিল কুরআন করীমের দ্বারা জিহাদ আরম্ভ করে দেওয়া। কিন্তু তারা অসময়ে তরবারির যুদ্ধের অবতারণা করে খৃষ্টানদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ করে দিল। আর এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হাজার হাজার মুসলমান খৃষ্টান হয়ে গেল। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সেই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি এই ত্রুটির দিকে জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু এই কারণে তাঁকে কুফরের ফতোয়া দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে এই ব্যক্তি ইসলামের উন্নতির পথে শত্রু। যদিও এই যুগে ইসলামের উন্নতির একমাত্র উপায় ছিল ইসলামের সঠিক শিক্ষার প্রচার ও প্রসার, যাতে খৃষ্টানদেরই একটি অংশকে জয় করে অন্য অংশের মন থেকে ভ্রান্তধারণাগুলির অপনোদন করা যায়। কিন্তু পরিতাপ, এই সেবার কারণে মুসলমানরা তাঁকে এত গালমন্দ করেছে, যে পরিমাণ গালি খোদার অন্য কোনও প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে হয়তো দেওয়া হয় নি।..... আমরা এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিব কিয়ামত দিবসে মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে। তিনি (সা.) স্বয়ং সেই সব অত্যাচারীর উপর নিজের অপ্রসন্নতা ব্যক্ত করবেন, আমাদের অন্তরে প্রশান্তির প্রলেপ দিবেন। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা। যাইহোক **'ফালা তাআজাল আলাইহিম'**- আয়াতে জিহাদের বিষয়টিকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা বলে দিয়েছেন যে, আমরা তাদের জন্য একটি সময় নির্ধারিত করে রেখেছি, তাদের ধ্বংসের মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে। সেই সময় উপস্থিত হলে আমরা স্বয়ং তাদের ধৃত করব।

(তফসীর করব, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৫)

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন-

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন, جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا (ফুরকান, রুকু-৫) অর্থাৎ হে মহম্মদ রসুলুল্লাহ্! তুমি নিশ্চয় যুদ্ধের সম্মুখীন হবে। কিন্তু সেই যুদ্ধই তোমার জীবনের একমাত্র কৃতিত্ব হয়ে থাকবে না, বরং এটি হবে তোমার জীবনের বহু কীর্তির ছোট্ট একটি অংশ মাত্র। তোমার জীবনের অর্জিত বস্তু হল এই যে, কুরআনের মাধ্যমে নিজের জাতিকে নিয়ে যুদ্ধ কর আর এটিই বড় যুদ্ধ হবে। তরবারির যুদ্ধ এই তুলনায় ক্ষুদ্রতর হবে।

এখন দেখুন এই ভবিষ্যদ্বাণী স্বমহিমায় পূর্ণ হল। মক্কাবাসীদেরকে নিঃসন্দেহে কিছু আরব গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে। কিন্তু সেই গোত্রগুলিও ছোট ছিল আর ফলাফলও ছিল ছোট। কিন্তু কুরআন করীম দ্বারা যে যুদ্ধ তাঁকে করতে হয়েছিল তা ছিল সমগ্র আরব, ইরান এবং এমনকি পরবর্তীকালে বহির্বিশ্বের সঙ্গেও, আর তা আজও অব্যাহত রয়েছে। যেদিন এই যুদ্ধের পরিণাম প্রকাশ পাবে সেদিন সারা পৃথিবীর অন্তরসমূহ ইসলামের জন্য বিজীত হবে আর মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাম্রাজ্য স্থল ও সমুদ্র পেরিয়ে পৃথিবীর প্রান্তে

শেষাংশ ৩৫ পাতায়

নিজের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে খোদার পথে জিহাদ কর এবং এই জিহাদ ও প্রচেষ্টার পরাকাষ্ঠা অর্জন কর।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রহে.)-এর বাণী

নিজের যাবতীয় শক্তি-সামর্থ্য দিয়ে খোদার পথে জিহাদ কর

পূর্বের গ্রন্থ সমূহে যে ইব্রাহিমি দোয়া এবং তাঁদের সমূহ ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যেত, সেগুলি অনুসারে আল্লাহ তা'লা নবী আকরম (সা.)-এর মাধ্যমে এক ঐক্যবদ্ধ মুসলিম জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। যেরূপ কুরআন করীমের সূরা হজ্জে বলেছেন-

وَجَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ (سورۃ الحج:79)

(সূরা হজ্জ-৭৯)

এখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, নিজেদের যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ নিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ কর,আর এই প্রচেষ্টা ও সংগ্রামকে পরম উৎকর্ষে পৌঁছে দাও। (হাক্কা জিহাদিহি) যথার্থরূপে জিহাদ কর, কেননা তিনিই তোমাকে নির্বাচিত করেছেন, সম্মানিত করেছেন এবং পরিপূর্ণ এক ধর্ম প্রদান করেছেন। তিনিই তোমার জন্য সর্বোত্তম আদেশাবলী অবতীর্ণ করেছেন, যেগুলি পালন করার জন্য যে যে শক্তি-বৃত্তির প্রয়োজন ছিল তা সবগুলিই তোমাদের দেওয়া হয়েছে। এই কারণে এই আদেশাবলী অনুসরণ করলে তোমার উপর কোনও বোঝা চাপে না। তোমাদের পিতা হলেন ইব্রাহিমের ধর্মের অনুসারি জাতি। আল্লাহ্ তোমদেরকে 'মুসলিমীন' নামে অভিহিত করেছেন। তোমাদেরকে উম্মতে মুসলেমা বা মুসলিম জাতি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তোমাদের সম্পর্কে পূর্বের গ্রন্থগুলিতে এই নামই ব্যবহৃত হয়েছিল। কুরআন করীমেও তোমাদেরকে اُمَّةً مُّسْلِمَةً-اَلْمُسْلِمِيْنَ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই নাম সেই সমস্ত দোয়ার পরিণাম যা হযরত ইব্রাহিম (আ.) করেছিলেন। তিনি দোয়া করেছিলেন পৃথিবীতে যেন এক মুসলমান জাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। (এই শ্রেষ্ঠ রসুলের আবির্ভাবের সঙ্গেই) আর তাদের সন্তানরাও মুসলমান জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়। খানা কাবার উদ্দেশ্যাবলীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে আয়াতগুলি রয়েছে তার মধ্যে وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ -এর দোয়া ছিল। কুরআন করীম সূরা হজ্জের এই আয়াতে দাবি করছে যে, সেই দোয়া গৃহীত হয়েছে। আর পূর্বের গ্রন্থগুলিতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল সেগুলি পূর্ণ হওয়ার সময় এসে গেছে, আঁ হযরত (আ.) আবির্ভুত হয়েছেন আর এক মুসলমানজাতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর কারণ হল মানুষের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তি রাখা হয়েছিল সেগুলি উন্মোচিত হওয়ার সময় চলে এসেছে। পৃথিবী এখন দেখবে, মানুষ কিভাবে নিজ প্রভুর পথে নিজের শক্তি খরচ করে এবং সামর্থকে পরম উৎকর্ষে পৌঁছে দেয়।

(খুতবাতে নাসের, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭৩২,প্রদত্ত, ৯জুন, ১৯৬৭)

সমগ্রজগতের পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা একত্রিত হয়েও কারো মনে কোনও পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না।

এই মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'লা খিলাফতে সানিয়ার মাধ্যমে যুক্তি-প্রমাণ ও স্বর্গীয় নিদর্শন দ্বারা ইসলামের বিজয়ের জন্য সমধিক উপকরণ সৃষ্টি করে চলেছেন এবং এই কাজ অব্যাহত রাখবেন, যতদিন পর্যন্ত না ইসলামের সেই চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়, যার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আবির্ভুত হয়েছেন, এবং মানবজাতি ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে রসুল আকরম (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ হয়ে ওঠে। এই বিজয় অর্জনের উদ্দেশ্যে যে জিহাদ বা সংগ্রামের প্রয়োজন তা তরবারির জিহাদ নয়, কেননা ইসলামের বিরুদ্ধে খাপ থেকে তরবারিগুলি বার করা হয় নি, কিম্বা ধর্মকে ধ্বংস করে দিতে পরমাণু বোমাও প্রয়োগ করা হচ্ছে না, শত্রুজাতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পরমাণু বোমা ব্যবহার করা হচ্ছে। আর এটিই স্বাভাবিক। শরীরের উপর এর মারাত্মক দুষ্প্রভাব পড়ে ঠিকই, কিন্তু ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পরমাণু বোমা ব্যবহার হয় না, আর করাও যেতে পারে না। কেননা যেরূপ আমি ইউরোপকে বলেছি, আপনাদেরকেও বলেছি যে সমগ্রজগতের পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা একত্রিত হয়েও কারো মনে কোনও পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। এতে সন্দেহ নেই যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারে । কিন্তু একটি হৃদয়কেও তা পরিবর্তন করতে পারবে না। অন্তরের পরিবর্তন আল্লাহ্র কৃপায় হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সঙ্গে সেই কৃপা যুক্ত করেছেন যার জন্য আমরা তাঁর যত মহিমা কীর্তনই করি না কেন, তা যথেষ্ট নয়। আমরা তাঁর দুর্বল বান্দা, তবু তিনি আমাদের উপর এত বেশি প্রতিদান ও পারিতোষিক দিচ্ছেন।

(খুতবাতে নাসের,৩য় খণ্ড, পৃ:২৪৭,প্রদত্ত, ৩১জুলাই, ১৯৭০)

আত্ম-সংশোধন এবং কুরআনের জ্যোতির মাধ্যমে শয়তানী অন্ধকারের বিরুদ্ধে জিহাদ একে অপরের পরিপূরক।

যতদূর জিহাদের সম্পর্ক, একে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম জিহাদ প্রাথমিকভাবে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদকে বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে সব প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা মানুষের প্রকৃতি ও ঐশী সন্তুষ্টির পরিপন্থী সেগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, অবদমন করা এবং সেগুলির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা। এর পরের পর্যায়ে এটিকে নিজের শক্তি-বৃত্তির গণ্ডির মধ্যে উচ্চতার শিখরে পৌছে দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার পরম ভালবাসা অর্জন করা। এটি এক প্রাথমিক জিহাদ যাকে জিহাদে আকবর বলা হয়। এখান থেকে জিহাদের ভিত রচিত হয়। অতঃপর এর উপরেই দ্বিতীয় প্রকারের জিহাদের অট্টালিকা তৈরী হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সফল জিহাদ না হয়, দ্বিতীয় প্রকারের জিহাদ যুক্তিগতভাবেই সম্ভব নয়। অতএব, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে মানুষের জিহাদ বা সংগ্রাম অর্থাৎ শয়তানি কুমন্ত্রণা এবং শয়তান সৃষ্ট কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদের সফলতা এবং আত্মসংশোধনের উপর নির্ভর করছে উভয় জিহাদের সফলতা । কেননা এটিই সব থেকে বড় জিহাদ। অন্য দুই প্রকারের জিহাদ এই ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। কাজেই মূল জিহাদটি যদি অসফল হয়, তবে অন্য দুই প্রকারের জিহাদের সফলতার সম্ভাবনাই নেই। এই জন্য সর্বপ্রথম আত্মসংশোধন আবশ্যক।

দ্বিতীয় প্রকার জিহাদ কুরআন করীম এবং এর প্রসারের জিহাদ, যেটিকে জিহাদে কবীর বলা হয়। জিহাদ আকবর অর্থাৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে এর উৎপত্তি। এদের পরস্পর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কেননা কুআনের শিক্ষা এবং জ্যোতি ব্যতিরেকে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তথাপি যতদূর প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদের সম্পর্ক রয়েছে, এর স্থান সর্বোপরি। অন্যথায় একথা স্বীকার করতে হবে যে, নিজে পালন করে না, অথচ অপরকে উপদেশ দেয়। এই জন্য কুরআন করীমের হিদায়াত অনুসারে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ অর্থাৎ আত্মসংশোধন এবং কুরআনের জ্যোতির মাধ্যমে শয়তানের অন্ধকারের বিরুদ্ধে জিহাদ- এই দুই একে অপরের পরিপুরক। যখন রিপুর তাড়না এবং শয়তানী কুমন্ত্রণা মানুষের আত্মাকে ঘিরে ধরতে চেষ্টা করে এবং তার এবং তার সৃষ্টিকর্তা রব-এর মাঝে ব্যবধান তৈরী করার চেষ্টা করে, তখন সেগুলি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অর্থাৎ আত্ম-সংশোধনের জন্য মানুষ কুরআন করীমকে মাধ্যম বানিয়ে নেয়। এছাড়া যেরূপ বলা হয়েছে, কুরআনের জ্যোতিকে ছড়িয়ে দেওয়া কুরআনের জ্যোতির মাধ্যমেই সম্ভব।

শেষাংশ ৩৫ পাতায়

নিজ প্রভুপ্রতিপালকের দিকে মানবজাতিকে আহ্বান করাই হল প্রকৃত, প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ জিহাদ।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহে.)-এর বাণী

ইসলামকে অন্যান্য সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করার তাৎপর্য

যখন একথা বলা হয় যে ইসলামকে এই উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তা সমগ্র পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মসমূহের উপর জয়যুক্ত হয়, তখন এর অর্থ মোটেই এই না যে তরবারি ধারণ কর। অর্থাৎ তরবারি হাতে নিয়ে সমগ্র জগতে ইসলাম প্রত্যাখ্যানকারীদের মুণ্ডুপাত করে বেড়াও, যারা স্বীকার করছে আর নতশির হচ্ছে, কেবল তাদের কাছেই শান্তির বার্তা নিয়ে যাও, বাকিদেরকে অরাজকতা ও যুদ্ধের বার্তা দাও- একথা না যুক্তিগ্রাহ্য, না বাস্তবে তা সম্ভব আর না কখনও হয়েছে। জামাত আহমদীয়াকে সবসময় এই নীতিকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে যে, আমরা যখন যুদ্ধ, জিহাদ এবং সমগ্র মানবজাতির উপর ইসলামকে জয়যুক্ত করার কথা বলি তখন তা কুরআন, মহম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর পরিভাষায় বলি। জাগতিক পরিভাষার সঙ্গে এগুলির কোনও সম্পর্ক থাকে না। এই কারণেই আজকের বিপর্যয়ের সময় সেই সব মুসলমান যারা এই কথাগুলি অনুধাবন করতে সক্ষম হয় নি, আর না সক্ষম হবে, তারা বিভিন্ন স্থানে নিজেদের বিপদের সম্মুখীন হতে দেখছে আর ক্রমশ তাদের অধঃপতন ঘটছে, কেননা তাদের নেতারা তাদেরকে ভ্রান্ত শিক্ষা দিয়ে থাকে। বিভিন্ন দেশে তারা দুর্বল সংখ্যালঘু হিসেবে বাস করছে, আর ইসলামের শিক্ষাকে ভুলভাবে তুলে ধরার পরিণামে নিজেদের প্রতিক্রিয়াকে সঠিক পথে রাখতে পারে না, ভুল পথে পরিচালিত করে যেখানে চলা তাদের জন্য সম্ভব নয়। এর পরিণামে ইসলাম প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হয় আর তা আরও বেশি সুনাম হানির কারণ হয়।

(খুতবাতে তাহের, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৫৬, প্রদত্ত খুতবা, ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৯১)

তিনটি মতবাদ যার কারণে ইসলামের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছে।

ইসলামী বিশ্বে অত্যন্ত ভয়ানক এমন সব বিষয় প্রচলন পেয়েছে যা ইসলামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। ইসলামের ন্যায়নীতিপূর্ণ শিক্ষাকে প্রণিধান করে তা গ্রহণ করার পরিবর্তে ইসলামকে পৃথিবীর সামনে এমন ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যার সঙ্গে ন্যায়নীতির দূরতম সম্পর্ক নেই। এর জন্য সব থেকে বড় অপরাধী মোল্লা ও রাজনীতিকগণ। এই দুইয়ের যুগলবন্দির পরিণামে ইসলামের বিচার ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। ইসলামের সঙ্গে এমন তিনটি মতবাদকে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, যেগুলির পরিণামে বর্হিবিশ্বে ইসলামের ভাবমূর্তি নির্মমভাবে বিকৃত হয়ে উপস্থাপিত হচ্ছে, আর ইসলামি দেশগুলি থেকেও শান্তি হারিয়ে যাচ্ছে।

প্রথম মতবাদ হল কোনও মতাদর্শের প্রসারে তরবারি প্রয়োগ বৈধ, এমনকি এটি আবশ্যিক। আর তরবারির বলে ধর্মবিশ্বাস পরিবর্তন করানোর নাম ইসলামী জিহাদ, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলা হয়ে থাকে যে, এই অধিকার কেবল মুসলমানদের। খৃষ্টান, ইহুদী, হিন্দু বা বৌদ্ধদের অধিকার নেই কোনও মুসলমানের ধর্মমত পরিবর্তন করার। কিন্তু খোদা তা'লা এর পূর্ণ অধিকার মুসলমানদের হাতে ন্যস্ত করেছেন। এ কেমন ন্যায়নীতি বর্জিত ও অজ্ঞতাপূর্ণ চিন্তাধারা! কিন্তু এটিকেই ইসলামের নামে সারা পৃথিবীতে ছড়ানো হচ্ছে।

এর দ্বিতীয় অংশটি হল এই যে, যদি কোনও অমুসলিম মুসলমান হয়ে যায় তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকার কারো নেই। সারা পৃথিবীর যে যেখানে খুশি নিজের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকুক, পৃথিবীর কোনও ধর্মাবলম্বীর অধিকার নেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার। কিন্তু যদি কোনও মুসলমান ভিন্ন কোনও ধর্ম অবলম্বন করে তবে পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলমানের অধিকার রয়েছে তার মুণ্ডুপাত করার। এটি ইসলামের দ্বিতীয় ন্যায় বর্জিত নীতি যা ইসলামের ধ্বজাবাহকরা কুরআন এবং খোদার নামে পৃথিবীর সামনে উপস্থাপন করে থাকে।

তৃতীয় নীতি হল মুসলমান দেশগুলির কর্তব্য ইসলামি শরিয়ত জোরপূর্বক সেই সব নাগরিকদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যারা ইসলামের উপর ঈমান আনে না। কিন্তু অন্য কোনও ধর্মের অধিকার নেই তাদের নিজেদের ধর্ম-বিধান মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার। কাজেই এই মতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইহুদীদের অধিকার নেই মুসলমানদের প্রতি তালমুদে বর্ণিত শিক্ষা অনুসারে আচরণ করার, হিন্দুদেরও অধিকার নেই মুসলমানদেরকে মনুসম্রিতিতে বর্ণিত শিক্ষা অনুসারে আচরণ করার। এটি হল ন্যায়নীতির তৃতীয় অবধারণা। এগুলি কেবল তিনটি দৃষ্টান্ত মাত্র,কিন্তু বাস্তবে যদি আপনি আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তবে আরও অনেক বিষয়ও প্রকাশ্যে আসবে যে মৌলবীদের উপস্থাপিত ইসলামের অবধারণা কুরআন করীমের সুস্পষ্ট ন্যায়-নীতির পরিপন্থী এবং তা রদ করার নামান্তর। আজ পৃথিবীতে ইসলামের বিরুদ্ধে সব থেকে বেশি ব্যবহৃত অস্ত্র এই তিনটি নীতিই, যেগুলির কারখানা মুসলমান দেশগুলিতে স্থাপিত হয়েছে। ইহুদী জাতি সব থেকে সফলভাবে এই তিনটি ইসলামী নীতিকে প্রয়োগ করেছে, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক- ইসলামী নীতিমালাকে মৌলবীদের স্বরচিত ইসলামি নীতি বলা উচিত, অর্থাৎ পশ্চিমা বিশ্বে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে উপস্থাপন করে দাবি করে এদের থেকে তোমরা কিভাবে শান্তি পেতে পার? এদের থেকে আমরা কিভাবে শান্তি পেতে পারি, যাদের ন্যায়ের অবধারণাই উন্মাদনাপূর্ণ, যার মধ্যে কোনও যুক্তি-তর্কের রেশও খুঁজে পাওয়া যায় না? মুসলমানদের জন্য এক প্রকার অধিকার, আর অন্যদের জন্য ভিন্ন প্রকার অধিকার, পৃথিবীতে কর্তৃত্ব করার সমস্ত অধিকার মুসলমানদের আর অন্যরা সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত! নাউযু বিল্লাহ্ মিন যালিক, যদি এটিই কুরআন নীতি হয়ে থাকে, তবে সমগ্র জগতবাসী অনিবার্যভাবেএই নীতি সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠবে আর মুসলমানদেরকে বিশ্ব-শান্তির জন্য ভয়ানক বিপদ হিসেবে ধরা হবে।

আরও একটি বিচিত্র বিষয় এই যে, জিহাদের দাবিও করা হয় আর ঘোষণাও করা হয়, সঙ্গে মোল্লাদের এই তিনটি নীতিকে স্বীকারও করা হয়। এটি রাজনীতিকদের দ্বিতীয় অপরাধ। একথা জানা সত্ত্বেও যে ইসলামের ন্যায় ব্যবস্থা এই ধরণের লড়াইয়ের উপদেশ দেয় না যে ধরণের লড়াইকে মোল্লারা জিহাদ আখ্যা দিয়ে থাকে। দেশের মধ্যে যখনই কোনও বিপদ এসে দেখা দেয় আর রাজনৈতিক যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, তখন তারা নিজেরাই মোল্লাদেরকে বলে তাদের সুরে সুর মিলিয়ে সাধারণ মানুষকে জিহাদের নামে আহ্বান করতে আরম্ভ করে। যার পরিণামে জগতবাসী এই দেশগুলির মানুষের প্রতি আরও বেশি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এবং তাদের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে বসে যে, তাদের রাজনৈতিক নেতারা মৌখিকভাবে এই দাবিই করে যে, ইসলামের জিহাদের অর্থ মোটেই এই নয় যে, তরবারি বলে মতবাদে প্রসার কর বা যুদ্ধে খোদার নাম ব্যবহার কর। কিন্তু যখনই প্রয়োজন দেখা দেয়, তখনই তারা এই মতবাদকে আঁকড়ে ধরে। এই জিনিসের বারংবার পুনরাবৃত্তি

শেষাংশ ৩৫ পাতায়

সেটিই জিহাদ যা ধর্মের উপর আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে করা হয়। অন্য কোনও যুদ্ধ জিহাদ নয়, সেগুলি মুসলমান দেশগুলির নিজেদের মধ্যে হোক বা মুসলমান দেশগুলির সঙ্গে অ-মুসলিম দেশগুলির হোক, কিম্বা রাজনৈতিক এবং জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ হোক।

(সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর বাণী)

আল্লাহ্ তা'লা ধর্মীয় যুদ্ধের ক্ষেত্রে সেই সকল অত্যাচারিত মানুষদেরকে অবশ্যই সাহায্য করে থাকেন যারা সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। সেই যুগে আঁ হযরত (সা.)-এর উপর যে অত্যাচার হয়ে আসছিল সেটি হল অত্যাচারের চরমমাত্রা। মুসলমানেরা মক্কায় যে শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, তা এর থেকে প্রতিটি মুহূর্তে প্রকাশ পাচ্ছিল। হিজরতের পরেও যদিও কোনও জাতির বিরুদ্ধে ধর্মীয় কারণে যুদ্ধ করা হয়েছে সেটি হল একমাত্র মুসলমান জাতি। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুসারে নিজের শক্তিমত্তার প্রমাণ দিয়েছেন। যদিও মুসলমানরা ছিল স্বল্প-সংখ্যক, সাজ-সরঞ্জাম হীন ও যুদ্ধের বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তথাপি তিনি মুসলমানদেরকে যখন যুদ্ধ করার আদেশ দিলেন, তখন তিনি তাদের সাহায্যও করলেন, ফেরেশতাদেরকে তাদের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করলেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য দিয়েছিলেন। সেটিই জিহাদ যা ধর্মের উপর আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে করা হয়। অন্য কোনও যুদ্ধ জিহাদ নয়, সেগুলি মুসলমান দেশগুলির নিজেদের মধ্যে হোক বা মুসলমান দেশগুলির সঙ্গে অ-মুসলিম দেশগুলির হোক, কিম্বা রাজনৈতিক এবং জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধ হোক বা সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক এবং দেশের অভ্যন্তরে জাতিসমূহের মধ্যে যুদ্ধ হোক।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা নিজের শক্তিমত্তার ঘোষণা দিয়ে বলেন, ধর্মের উপর আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ধর্মের অনুসারীদেরকে আমি সাহায্য করব। আর যেহেতু আল্লাহ্‌র ঘোষণা অনুসারে এখন শেষ এবং পরিপূর্ণ ধর্ম হল ইসলাম। তাই তিনি মুসলমানদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এবং 'ইন্নাল্লাহ্ কাবিউন আযিয' অর্থাৎ আল্লাহ পরম শক্তিমত্তার অধিকারী, এই ঘোষণা দেওয়ার পর তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনও ধর্মীয় যুদ্ধ হয়, তিনি তাদের সাহায্য করবেন। অতএব বর্তমান যুগে যে সব আক্রমণ, অরাজকতা বা যুদ্ধ হচ্ছে, যেগুলিতে মুসলমানেরা জয়যুক্ত হওয়ার পরিবর্তে লাঞ্ছনার সম্মুখীন হচ্ছে, তা থেকে প্রমাণিত হয় আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে এগুলি জিহাদ নয়। না এগুলি ধর্মীয় যুদ্ধ। আর এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা সমর্থনও তাদের সঙ্গে নেই।

(খুতবাতে মসরূর, ৭ম খণ্ড, প্রদত্ত খুতবা ৯ অক্টোবর, ২০০৯)

সম্প্রতি এখানকার এক পত্রিকার একজন কলামিস্ট লিখেছেন একইভাবে একজন অস্ট্রেলিয়ান রাজনীতিবিদও বলেছেন,ইসলামী শিক্ষায় জিহাদ এবং অপরাপর যত নির্দেশাবলী রয়েছে তার কারণেই মুসলমানরা উগ্রপন্থী হয়ে উঠছে।..... আজকাল ইসলামের নামে ইরাক এবং সিরিয়ায় যে উগ্রপন্থী গোষ্ঠী কিছু অঞ্চল দখল করে নিজেদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে তারা পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সরকারকে কেবল যে হুমকি-ধমকীই দিয়েছে তা-ই নয় বরং কোন কোন স্থানে পাশবিক এবং নৃশংস আক্রমণ চালিয়ে প্রাণহানিও ঘটিয়েছে। ..... এ বিষয়টি যেখানে সাধারণ মানুষকে ভীত-ত্রস্ত করে তুলেছে সেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কতক নেত্রীবৃন্দকে তাদের অজ্ঞতা বা ইসলাম সম্পর্কে মুখ খোলার সুযোগ করে দিয়েছে। বক্তারা এবং লেখকরা একথা বলে এবং লিখে যে, নিঃসন্দেহে অন্যান্য ধর্মের শিক্ষায়ও কিছ কঠোর আদেশ-নিষেধ থেকে থাকবে কিন্তু সেসব ধর্মের মান্যকারীরা হয়তো তা অনুসরণ করে না বা পরিস্থিতি অনুসারে তাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটিয়েছে আর যুগের চাহিদা অনুসারে শিক্ষায় পরিবর্তন এনেছে।

আমরা মানি এবং জানি, ইসলাম সম্পর্কে কতিপয় মুসলমান গোষ্ঠীর ভ্রান্ত আচরণ এই ধর্মকে দুর্নাম করে রেখেছে কিন্তু এর জন্য কুরআনী শিক্ষাকে আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত করা আর এক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের হৃদয়ের হিংসা এবং বিদ্বেষেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এর এক চরম বহিঃপ্রকাশ হলো আজকাল আমেরিকার একজন প্রেসিডেন্ট পদ-প্রার্থীর ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে মন্তব্য করা। যাহোক ইসলাম সম্পর্কে এরা যা ইচ্ছা বলতে পারে। কিন্তু ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার মোকাবিলা কোনও ধর্মীয় শিক্ষাও করতে পারবে না আর তাদের নিজেদের প্রণীত কোনও আইনও নয়।

সম্প্রতি এখানে ব্রিটিশ সংসদে গ্লাসগোর একজন এম.পি ইসলামের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে আহমদীয়া জামাতের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'ইসলামের শান্তি এবং নিরাপত্তাপূর্ণ শিক্ষা যারা মেনে চলে তারা হল, আহমদী মুসলমান। আমি গ্লাসগোতে তাদের একটি শান্তি সম্মেলনের অর্থাৎ পিস সিম্পোজিয়ামে যোগ দিয়েছিলাম। তিনি এর ভূয়সী প্রশংসা কনে।' তখনই সেখানে উপস্থিত বৃটিশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা হোক সেক্রেটারী বলেন, ' আহমদীরা যে ইসলাম তুলে ধরে তা সত্যিই সেই শিক্ষা থেকে পৃথক যা উগ্রপন্থী মুসলমানেরা তুলে ধরে। আর সত্যিকার অর্থে আহমদীরা শান্তিপ্রিয় নাগরিক। সত্য কথা হলো, আহমদীরা নতুন কোন শিক্ষা তুলে ধরে না বরং কুরআনী শিক্ষাই উপস্থাপন করে।' কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন ঘটনার পর আমরা যদি নীরব হয়ে যাই তাহলে কিছুদিন পর মানুষ ভুলে যাবে যে, হ্যাঁ বৃটিশ সংসদে একটি প্রশ্ন উঠেছিল আর এটিই সবকিছু! এটিকে এখন সবসময় স্মৃতিপটে জাগ্রত রাখতে হবে যে, ইসলামী শিক্ষা কী। একবার প্রচার মাধ্যম হয়তো সংবাদ প্রকাশ করে এরপর তারা নীরব হয়ে যায়। কিন্তু উগ্রতামূলক কোন ঘটনা যদি ঘটে বা না ঘটলেও এর বরাতে পত্রিকায় লাগাতার শিরোনাম ছাপা হয় আর তখনই ইসলাম বিরোধীরা ইসলামের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সুযোগ পায়।

সম্প্রতি আমার জাপান সফরকালে সেখানেও শিক্ষিত শ্রেণী একথারই বহিঃপ্রকাশ করেছিল বরং একজন খ্রিস্টান পাদ্রীও বলেন, এই ইসলামী শিক্ষা যা আপনি কুরআনী শিক্ষার আলোকে তুলে ধরছেন, জাপানীদের এ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার খুবই প্রয়োজন রয়েছে বরং পৃথিবীবাসীর এর প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, এটি তখনই কল্যাণকর হবে যদি এই কথাকে এই অনুষ্ঠান পর্যন্ত সীমিত না রাখা হয় যাতে আপনি বক্তৃতা করেছেন বরং এই শিক্ষা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন।

কাজেই প্রত্যেক আহমদীর এটি অনেক বড় দায়িত্ব যে, ধর্মের নিজস্ব গুণাবলী উপস্থাপন করার জন্য তারা যেন কুরআন করীমের জ্ঞান অর্জন করে, অতঃপর নিজেদের পুণ্যের দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে পৃথিবীকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করা। এই শিক্ষামালা ও কর্মগুণেই আমরা এই যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দাসত্ব স্বীকার করে কুরআন করীম এবং ইসলামকে রক্ষার কাজে নিজেদের অবদান রাখতে পারি এবং পৃথিবীবাসীকে দেখাতে পারি যে, পৃথিবীতে যদি প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তবে তা কুরআন করীমের দ্বারাই সম্ভব।

..... অতএব ইসলামী শিক্ষা বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করার শিক্ষা, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার শিক্ষা, প্রেম এবং ভালবাসার বাণী প্রচার ও প্রসারের শিক্ষা। কতিপয় মুসলমান দল যদি এই শিক্ষা না

শেষাংশ ৩৬ পাতায়

যদিও আমরা অনেকে পৃথিবীর জটিল পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত আছি, কিন্তু অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেন না যে, কয়েকটি দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক কিরূপ সংকীর্ণ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আর এই সংকীর্ণতা কিরূপ ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনতে পারে।

বর্তমান পৃথিবীতে পারমাণবিক বোমার এমন বিশাল ভাণ্ডার মজুত রয়েছে যা কয়েক ঘন্টার মধ্যে মানবসভ্যতাতে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলার জন্য যথেষ্ট, তথাপি আশ্চর্য হতে হয় যে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কার দিকে আমাদের মনোযোগ খুব কম।

পরমাণু অস্ত্র-প্রসার রোধ সাধারণ মানুষের চাপেই হওয়া সম্ভব।

অর্থাৎ যখন মানবতার কণ্ঠের সামনে অস্ত্র-ব্যাবসায়ী এবং যুদ্ধের ইন্ধনদাতা বিশ্বের শাসকশ্রেণীর কণ্ঠস্বর অবদমিত হয়।

বিভিন্ন জাতি ও তাদের নেতার উচিত হবে নিজেদের মনোযোগ জাতীয়-স্বার্থে কেন্দ্রীভূত রাখার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক স্বার্থকে সামনে রাখা।

প্রত্যেক পক্ষকে সহনশীলতার স্পৃহা নিয়ে পৃথিবীতে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির প্রসারে এক ও অভিন্ন লক্ষ্য অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত।

এমন যুদ্ধের বিজয়ী কেউ হতে পারে না যেখানে প্রত্যেকে নিজেদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। বিশেষ করে যদি তা শেষমেশ পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগে প্ররোচিত করে আর এই সম্ভাবনাকেও প্রত্যাখ্যান করা যায় না।

আমরা যদি বর্তমান যুগের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির অগভীর ভাবে বিশ্লেষণ করি, তবে স্পষ্ট হবে যে পৃথিবীর ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

পৃথিবী এমন এক আবর্তে আটকে পড়েছে যেখানে একটি বিবাদ অপর একটি বিবাদের জন্ম দিচ্ছে। কেননা পারস্পরিক শত্রুতা এবং বিদ্বেষ পূর্বের চেয়ে বেশি পুঞ্জীভূত হচ্ছে।

শরণার্থী সংকটের দীর্ঘস্থায়ী সমাধান এটিই যে, যুদ্ধ প্রভাবিত দেশগুলিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। সেখানে নিরুপায় অবস্থায় ভয় এবং চরম অর্থ-সংকটের মধে দিন কাটাতে বাধ্য সাধারণ মানুষকে সহায়তা দেওয়া হোক যাতে তারা স্বাবলম্বী হয় এবং শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত দ্বারা আয়োজিত ১৬তম শান্তি সম্মেলনে সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক র প্রদত্ত ১৬ ই মার্চ , ২০১৯, তারিখের সভাপতি ভাষণ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম।

সম্মানীয় অতিথিবৃন্দ! আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু

প্রতি বৎসর আহমদীয়া মুসলিম জামাত এই পিস সিম্পোযিয়াম অনুষ্ঠান করে। যাতে সমসাময়িক সমস্যা ও সাধারণ পরিস্থিতির সমীক্ষা করা হয়। আমি ঐ সমস্ত সমস্যাবলীর ইসলামী শিক্ষার আলোকে সমাধান উপস্থাপন করার চেষ্টা করে থাকি। যতদূর সম্ভব এই প্রসঙ্গের সাথে সম্পর্ক যুক্ত, বিশ্ব-স্তরে এই অনুষ্ঠানের কিরূপ প্রভাব বিন্যস্ত হয়। আমি পূর্বেও বলেছি, এটা আমি জ্ঞাত নই। তথাপি এর থেকে বাকী পৃথিবীর উপর কী প্রভাব বিস্তার হয়, তা উপেক্ষা করেও আমরা ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং শান্তির প্রসারে স্বীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। আমি বিশ্বাস রাখি, আপনারা প্রত্যেকে আমার মত বিশ্বে প্রকৃত ও চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আভলাষী।

নিশ্চিতরূপে আপনারা সবাই চান, বর্তমান যুগে বিশ্বে শান্তি ও সুখকে বিনষ্টকারী যুদ্ধবিগ্রহ এবং বিবাদসমূহের অবসান হোক। এমন এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠা হোক, যেখানে জাতিসমূহ একে অপরের অধিকারের প্রতি যত্নবান থেকে পরস্পর মিলে মিশে শান্তির সাথে বসবাস করতে পারে। কিন্তু এটা এক চরম দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবসত্য যে, যেখানে যুদ্ধ ও বিবাদ থেকে বিরত থাকা উচিত ছিল, সেখানে প্রতি বৎসর এর বিপরীত চিত্রই দেখা যাচ্ছে। শত্রুতা চরম আকার ধারণ করেছে আর যুদ্ধ নিত্য-নতুন রণাঙ্গনে উন্মুক্ত হচ্ছে। অপরদিকে প্রথম থেকে বিরাজমান পারস্পরিক বিরোধ মিটতে দেখা যায় না।

যদিও আমরা বিশ্বের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত। কিন্তু অধিকাংশ লোক এই বিষয়ে অবগতই নয় যে, কত দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে। আর এই তিক্ততার কত ধ্বংসাত্মক ফল সংকলিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ Bloomber businessweek পত্রিকার বিগত সংখ্যায় পিটার কয় নামে একজন সাংবাদিক লিখেছেন, "যদিও পৃথিবীতে এই সময় এত পরিমাণ আণবিক অস্ত্র মজুদ আছে যা কয়েক ঘন্টায় মানব সভ্যতাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে দিতে যথেষ্ট। এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার। আণবিক যুদ্ধের আশঙ্কার দিকে পৃথিবীবাসীর মনোযোগ খুব কম। এখন যেহেতু আমেরিকা ও রাশিয়ার অস্ত্র প্রসার

রোধক চুক্তি সমাপ্ত হয়েছে, অতএব এই দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। এরূপ প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আণবিক অস্ত্রের এক নতুন প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হচ্ছে॥ যতদূর সম্ভব এই বিষয়ের সাথে সম্পর্ক, একজন সাধারণ মানুষ এই বিষয়ে কি করতে পারে? তবে অস্ত্র প্রসার নীতির অবসান সম্ভব সাধারণ মানুষের নেতিবাচক চাপে। অর্থাৎ যখন যখন মানবতার কণ্ঠস্বরের সম্মুখে অস্ত্রের ব্যবসায়ীরা ও সর্বদা যুদ্ধের ইন্ধনদাতা বিশ্বের শাসকশ্রেণীর কণ্ঠস্বর অবদমিত হয়।

প্রবন্ধ লেখক নিজ প্রবন্ধ Middlebury Institute of International studies এর সাথে সংযুক্ত Nikolai Sokov এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি সতর্কীকরণও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। "সমস্ত লক্ষণাবলী এই বিষয়ের প্রতি নির্দেশ করছে যে ইউরোপীয় দেশগুলি বিপজ্জনক সীমা পর্যন্ত পারমাণবিক অস্ত্র ও পারম্পরিক অস্ত্র-শস্ত্রের প্রতিযোগিতায় একে অপররের থেকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে।"

এই প্রবন্ধের অবশিষ্টাংশে এই বিষয়রে প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে যে, বিশ্বস্তরে অস্ত্রের এক নতুন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। অধিকন্তু আণবিক যুদ্ধের বিপদের ধরণকে সাধারণ জ্ঞান করা উচিত নয়।

সাম্প্রতিককালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট আকস্মিক উত্তেজনার পরিস্থিতি বিশ্বের সামনে রয়েছে। এই দুটি দেশই আণবিক শক্তি সম্পন্ন। এরা উভয়ে বিভিন্ন দেশের সাথে প্রকাশ্য ও গোপন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করে রেখেছে। যে সব কারণে তাদের মধ্যে সংঘটিত যে কোন যুদ্ধের সম্ভাব্য পরিণতি অত্যন্ত ব্যাপক ও ধ্বংসাত্মক হবে।

আমি বারবার এই বিষয় প্রকাশ করেছি। কিছু আণবিক শক্তির নেতারা সর্বদা পরমাণু বোমা ব্যবহার করার জন্য দেখা যাচ্ছে প্রস্তুত হয়ে আছে। যদ্বারা অনুভূত হচ্ছে, হয়ত তারা এই ভয়াবহ পরিণতি সম্বন্ধে জ্ঞাত নয়। এই অস্ত্র না শুধু ঐ সমস্ত দেশকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলতে সক্ষম, যাদের বিরুদ্ধে এগুলি ব্যবহৃতহয়। বরং ঐগুলির ব্যবহার সারা দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগজনক। এই জন্য এটাই আবশ্যক জাতি-সমূহ এবং তাদের নেতারা শুধু নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার পরিবর্তে বিশ্ব-স্বার্থে সম্মুখ দৃষ্টি রাখুন। শান্তির প্রসারে অন্যান্য দেশ ও সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা করা অত্যন্ত গুরুত্ববহ। প্রতিটি পক্ষকে সহনশীলতার স্পৃহা নিয়ে বিশ্বে দীর্ঘস্থায়ী শান্তির প্রসারের ন্যায় এক অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা করা উচিত।

SpiegelOnline কে দেওয়া সম্প্রতি একটি সাক্ষাতকারে জার্মানীর প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী Sigmar Gabriel সতর্ক করে বলেছেন, বিশ্ব-বর্তমান ভূ-রাজনীতির পরিণামে উদ্ভুত বিপদকে অবজ্ঞা করছে। তিনি বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিকে ইং ১৯৪৫ সাল এবং ইং ১৯৮৯ সাল এর পরিস্থিতির সাথে তুলনা করে বলেন, "বিশ্ব পরিস্থিতি অতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে।..... পাশ্চাত্য বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে।.... বিগত সত্তর বৎসর কালে সংঘটিত একটি সুস্পষ্ট পরিবর্তন এই যে, প্রথমে আমেরিকাকে একটি বিশ্বস্ত দেশ হিসেবে মনে করা হত। কিন্তু আজ আমরা এমন একটা যুগের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছি যখন ইউরোপ স্বায়ত-শাসন যুদ্ধের সম্মুখীন। "

এইরূপে নিউইয়র্ক টাইমসের একটি প্রবন্ধে রাশিয়ার প্রাক্তন নেতা Michail Gorbachev বিবৃতি দেন, আমেরিকা রুশের মধ্যে সাম্প্রতিক আই.এন.এফ চুক্তি সমাপ্ত হওয়ার ফলে আণবিক অস্ত্রে এক নতুন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। তিনি লেখেন, " অস্ত্রের এক নতুন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। সামারিকীকরণের পরিণামে উদ্ভুত আই.এন.এফ চুক্তির পরিসমাপ্তি বিশ্বে এই প্রথম কোনও ঘটনা নয়। ইতিপূর্বেই ২০০২ সালে আমেরিকা অ্যান্টি ব্যালাস্টিক মিসাইল চুক্তি থেকে সরে এসেছিল। এই বছরে ইরানের সাথে আণবিক চুক্তির অবসান হওয়াও এই প্রবণতার পরিণাম। সামরিক ব্যয় আকাশ ছোঁয়া এবং দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে সতর্ক করে গবার্চ লেখেন, এরূপ যুদ্ধে কেউ জয়লাভ করতে পারে না। যারা সবাই মিলিত হয়ে নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করছে। বিশেষতঃ যদি তারা আণবিক অস্ত্র ব্যবহারে অগ্রগামী হয়। এই সম্ভাবনাকে খণ্ডন করা যেতে পারে না। বেপরোয়া অস্ত্রের প্রতিযোগিতা, আন্তর্জাতিক স্তরে উত্তেজনা, শত্রুতা এবং অবিশ্বাসের পরিবেশ আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার কাজ করছে।"

সুতরাং বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতিবিদরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, আণবিক যুদ্ধ এখন আর ধারণাতীত নয়, বরং আশঙ্কা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও একে অবজ্ঞা করা যেতে পারে না।

যদি আমরা বর্তমান কালের বাছাই করা সমস্যাবলীর মোটামুটি পর্যবেক্ষন করি, তাহলে এই বিষয় প্রতীয়মান হয়ে যাবে পৃথিবীর ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গত বছর আমেরিকা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে দাবি করেছিল, তাদের উত্তর কোরিয়ার সাথে একটি ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি হবে। এখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে এই বিষয়ে কোন বিশেষ কৃতকার্যতা লাভ হয় নি।

এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে চলমান বিবাদ তীব্র আকার ধারণ করেছে। প্রায় এক দশক থেকে সিরিয়ায় রক্তপাত অব্যাহত রয়েছে। দেশে চরম অরাজকতা বিরাজ করছে। এটা বলা হচ্ছে গৃহযুদ্ধ প্রায় শেষের দিকে। কিন্তু গত দশ বছরে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু আর এর চেয়ে অধিক সংখ্যক লোকের গৃহহারা হওয়া ছাড়া কী লাভ হয়েছে? এই সমস্ত কর্মকাণ্ডের কোনও সদর্থক পরিণাম প্রকাশ পায় নি। এখন ভবিষ্যত অনিশ্চিত ও আশঙ্কাপূর্ণ। কেননা এই সমস্ত দেশ যাদের ব্যক্তিস্বার্থ সিরিয়ার ভবিষ্যতের সাথে জড়িত, তাদের মধে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একদিকে রাশিয়া ও তুরস্কের জোট, তো অন্যদিকে আমেরিকা ও সৌদি আরব মিলিত হয়ে ইরানের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। এবং তারা আরও বেশি নিষেধাজ্ঞা চাপানোর চেষ্টায় আছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ খোলাখুলিভাবে একথা প্রকাশ করছেন যে, ঐসমস্ত দেশের উদ্দেশ্য কেবল মধ্যপ্রাচ্যের উপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা।

তুরস্ক ও কুর্দ জাতির মধ্যে বিশৃঙ্খল অবস্থা আরও একটি উদ্বেগজনক ব্যাপার, যেখানে কুর্দরা স্বায়ত্বশাসন লাভ করতে চাইছে।

সুতরাং বিশ্ব এক জটিল

যুগ ইমামের বাণী

সেই সময় দূর নয় বরং অতি নিকটেই যেদিন তোমরা আকাশ থেকে ফিরিশতাদের ফৌজ এশিয়া,ইউরোপ ও আমেরিকার মানুষের মনে অবতীর্ণ হতে দেখবে।

-ফতেহ ইসলাম, রূ-খা, খণ্ড-৩, পৃ: ১২

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, Amaipur, Birbhum

যুগ ইমামের বাণী

কুরআন করীম অনুধাবন করা এবং সেই অনুসারে হেদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া আবশ্যিক ও মূল বস্তু।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Golam kibria, Jamat Ahmadiyya Santoshpur

আবর্তে আটকে পড়েছে, যেখানে একটি বিবাদ নতুন অন্য একটি বিবাদ সৃষ্টি করছে। কেননা পারস্পরিক শত্রুতা ও ঘৃণা পূর্বের থেকে গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। কেউ জানেনা এই সমস্যা আমাদেরকে শেষে কোথায় নিয়ে যাবে এবং এর কত ভয়াবহ ফল প্রকাশিত হবে। এই সব কিছু আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ণনা করেছি। এইসব ব্যতীত অনেক এমন উদ্বেগজনক সমস্যা রয়েছে, যদ্বারা বিশ্বের শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধি ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এটা বলা হচ্ছে , সন্ত্রাসবাদী সংগঠন দায়েশ বা ইসলামিক স্টেট এখন নিজেদের বিনাশের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের তথাকথিত খেলাফতের পতন ঘটেছে। কিছু বিশেষজ্ঞ এখনও সর্তক করছেন। যদিও 'দায়েশ' নিজ এলাকায় আধিপত্য হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু তার চরমপন্থী মতবাদের প্রাণের স্পন্দন এখনও অবশিষ্ট আছে। তাদের যে সমস্ত সদস্যরা বেঁচে গেছে, তারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। তারা যে কোনও সময় দ্বিতীয়বার সুসংঘবদ্ধ হয়ে ইউরোপে কিম্বা অন্য কোনও স্থানে আক্রমণ করতে পারে। অধিকন্তু পশ্চিমী দুনিয়ার মস্তিষ্কে জাতীয়তাবাদের উন্মাদনা পুনরায় মাথা চাড়া দিয়েছে। আর দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে যুক্ত উগ্রপন্থীরা জনপ্রিয়তা লাভ করছে।

এই সমস্ত দলগুলি অবশ্য রাজনৈতিকভাবে স্পষ্ট সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে নি। তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে ন্যায় প্রতিষ্ঠা না হয়, এই সব পার্টিগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকবে। তাদের জনপ্রিয়তার একটা বড় ও মৌলিক কারণ শরণার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি। যদ্বারা জনসাধারণের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে। আর এই ধারণা ক্রমশঃ বদ্ধমূল হচ্ছে যে, এই সমস্ত দেশের জন্মগত নাগরিকদের সম্পদ তাদের উপর খরচ হওয়ার পরিবর্তে বিদেশী শরণার্থীদের সাহায্যার্থে খরচ করা হচ্ছে। আমি পূর্বেও এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, তাই পুরাতন কথা পুনরুক্তি করতে চাই না। এটা বলা যথেষ্ট, যদি শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রকৃত প্রচেষ্টা করা হয় এবং সব দেশকে উন্নতির জন্য সাহায্য দেওয়া হয়, তাহলে লোকেরা নিজ ঘর থেকে পালিয়ে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হওয়ার বাধ্যবাধকতা ও ইচ্ছা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্ষীণ হয়ে যাবে।

জনসাধারণ শুধু এটাই চায়, তারা যেন নিজ পরিবার-পরিজনের ভরণপোষন করতে সক্ষম হয়। তাদের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলে উন্নত জীবন লাভের জন্য এই সব লোকেরা নিজ দেশত্যাগ করার চেষ্টা করবে। সুতরাং শরণার্থী সমস্যার স্থায়ী সমাধান এটাই যে, যুদ্ধ প্রভাবিত দেশে শান্তি স্থাপন করা। সেখানে নিরুপায় অবস্থায় ভয় ও দারিদ্রতার সাথে জীবনযাপন করতে বাধ্য জনসাধারণের সাহায্য করা, যাতে তারা নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং শান্তির সাথে জীবনযাপন করতে পারে।

সংক্ষিপ্তভাবে এটাই যে, শরণার্থী বা রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীরা যখন নিজ দেশের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় পরিস্থিতির কারণে পাশ্চাত্য দেশে প্রস্থান করে, তখন তাদের সাথে যেমন শ্রদ্ধা ও সম্মানজনক আচরণ হওয়া উচিত। তেমনি এটাও লক্ষ্য করা উচিত যে, তাদের সাহায্য ও সুবিধা প্রদান করতে গিয়ে স্থানীয় নাগরিকদের সুযোগ সুবিধায় যেন প্রভাব না পড়ে।

শরণার্থীরা দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারি অনুদান স্বরূপ ভাতা ও অনুগ্রহ নিয়ে জীবনযাপন করতে থাকুক, তার চেয়ে বরং তারা নিজেরাই যেন যথাশীঘ্র জীবনোপকরণের উপযোগী কোনও উপায় উদ্ভাবন করে সে জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা উচিত। তাদের নিজেদেরও উচিত পরিশ্রম করে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করা, সমাজের উন্নতিতে সদর্থক ভূমিকা পালন করা। নতুবা যদি তারা অবিরত করদাতাদের অর্থ থেকে সাহায্য পেতে থাকে, তাহলে অবশ্যই অভিযোগ সৃষ্টি হবে।

আমি এটা বুঝতে পারছি, সমাজে বিদ্বেষ ও অস্থিরতা সৃষ্টি করতে জীবিকা ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রধান ভূমিকা রয়েছে। কিছু কিছু সংগঠন এই অস্থিরতাকে অন্যায়ভাবে কাজে লাগিয়ে শরণার্থীদের কিংবা কোনও বিশেষ ধর্মবালম্বীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলে এবং তাদের বিরুদ্ধে ঘৃণার প্রসার করে।

সুতরাং ইউরোপের মানুষের মধ্যে এই প্রতীতি জন্মেছে যে, এশিয়া ও আফ্রিকার মানুষেরা বিশেষতঃ দেশত্যাগী মুসলমানরা তাদের সমাজের জন্য বিপজ্জনক। আমেরিকাতেও লোক মুসলমান ও স্পেনীয় মানুষজনের সম্বন্ধে যারা মেক্সিকানদের দ্বারা সে দেশে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে, তাদের সম্পর্কেও এই রকমের আশঙ্কা পোষণ করে। যাহোক আমার এই বিষয়ের উপর দৃঢ় বিশ্বাস, যদি বৃহৎ শক্তিগুলি ব্যক্তিস্বার্থ উপেক্ষা করে আন্তরিক হয়ে দরিদ্র দেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিতে সচেষ্ট হয়, তাদের সঙ্গে সহানুভুতি, সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করে, তবে এইরকমের সমস্যা সৃষ্টিই হবে না।

এখানে ব্রিটেনে ব্রেক্সিট ও ভবিষ্যতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে ব্রিটেনের সম্পর্ক সম্বন্ধে পরিস্থিতি অত্যন্ত অনিশ্চিত। ইং ২০১২ সালে ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টে আমার বক্তৃতায় এই প্রসঙ্গে আমি স্পষ্টভাবে একথা ব্যক্ত করে বলেছিলাম, "আপনাদের একে অপরের অধিকারকে সম্মান করে এই ঐক্য বজায় রাখার সবরকম প্রচেষ্টা করা উচিত। জনসাধারণের ভীতি ও উৎকণ্ঠা যে কোনও প্রকারে দূরীভুত হওয়া চাই।"

আমি ঐ সময় বলেছিলাম যে, ইউরোপের শক্তিশালী হওয়া ঐক্যবদ্ধতার মধ্যে নিহিত। এই প্রকারের একতা না শুধু এখানে ইউরোপের লাভ হবে, বরং বিশ্বস্তরে এই একতা এই মহাদেশের প্রভাব প্রতিপত্তি স্থাপন করার মাধ্যম হবে।

সাত বৎসর পূর্বে আমি নিজ বক্তৃতায় অভিবাসন সম্পর্কে জন-সাধারণের ভয়-ভীতি দূর করার গুরুত্ব ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ঐক্যস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলাম।

তথাপি মানুষের মনে বদ্ধমূল আশঙ্কার প্রতি সম্পূর্ণরূপে মনোযোগ দেওয়া হয়নি। একারণে সমগ্র ইউরোপের লোকেরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের উপযোগিতার নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে। ব্রেক্সিট এর নিকৃষ্টতম উদাহরণ । কিছু ইউরোপীয় দেশে যেমন ইতালি, স্পেন ও এমনকি জার্মানীতেও জাতীয়তাবাদী দলগুলি জনপ্রিয়তা অর্জন করছে এবং

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নিজ সন্তানদেরকেও সম্মান দেওয়ার রীতি অবলম্বন কর এবং তাদেরকে সর্বোত্তম পন্থায় প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা কর।

(ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নিজ সন্তানদেরকেও সম্মান দেওয়ার রীতি অবলম্বন কর এবং তাদেরকে সর্বোত্তম পন্থায় প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা কর।

(ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararbhita (Assam)

রাজনৈতিক ময়দানের আসনেও জয়লাভ করছে। এ কারণে তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নকে আরও শক্তিহীন করার প্রয়াসের পাশাপাশি অভিবাসন বিরোধী এজেন্ডার প্রসার করছে।

আমার ধারণা ছিল, ইউরোপ নিজ ঐক্যের আরও প্রসার ঘটাবে। কিন্তু গত কয়েক বৎসর থেকে এখানে বিভেদ ও এর ফলে উদ্ভুত বিশৃঙ্খলা ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এইরকম অস্থিরতা কেন সৃষ্টি হচ্ছে? এই অস্থিরতা কিছুটা অর্থনৈতিক কারণ থেকে আর কিছুটা কোনও কোনও রাষ্ট্রের জনসাধারণের সাথে ন্যায় ও বিচারের ব্যাপারে ব্যর্থতা, এবং স্বীয় নাগরিকদের অধিকারসমূহ রক্ষা করতে অপারগতার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। আমার দৃষ্টিকোণ এটাই যে, বিশ্বস্তরে পারস্পরিক সহযোগিতা বিশ্বের পরিস্থিতি উন্নতি সৃষ্টি করতে ও ঐক্যবদ্ধ থাকতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। এই বিষয়টিকে সামনে দৃষ্টিতে রেখে আমি ইউরোপীয় পার্লামেন্টে বলেছিলাম,"ইসলামী দৃষ্টিকোণ অনুসারে আমাদের সারা বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেষ্টা করা উচিত। কারেন্সির দিক থেকেও সারা বিশ্বকে একত্রিভূত হওয়া উচিত। এইভাবে ব্যবসা-বানিজ্যের দিক থেকেও এক হওয়া উচিত। এছাড়াও অবাধ যাতায়াত এবং অভিবাসনের জন্যও উপযোগী এবং বাস্তবায়নযোগ্য নীতি প্রণয়ন করা উচিত যাতে সারা বিশ্ব এক হয়ে যায়।"

সুতরাং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি এটাই যে, ঐক্য স্থাপনই শান্তির সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে আমরা বিচ্ছিন্নতার শিকার, আর বিশ্বের সম্মিলিত স্বার্থের উপর ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস, এই প্রকারের নীতি আগামীকালে বরং বর্তমানকালে বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তাকে দুর্বল করার হেতু হচ্ছে। ইসলামী শিক্ষার আলোকে শান্তি-প্রতিষ্ঠার এক মৌলিক দাবি এটাই যে, জাতিসমূহ যেন একে অপরেরর সাথে ন্যায়ের আচরণ অব্যাহত রাখে।

যদি কিছু দেশ সমস্যার সম্মুখীন হয়, তাহলে অন্যান্য জাতির উচিত ঐ সমস্ত দেশকে নিঃস্বার্থ হয়ে সাহায্য করা আর ব্যক্তি স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ কোরআন করীমে আছে, যদি দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বা মত পার্থক্য হয়, তাহলে অপরাপর জাতির উচিত তারা যেন কোনও পক্ষের পক্ষপাতিত্ব না করে সালিস বা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। আর সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান করার চেষ্টা করে। হ্যাঁ, যদি এক পক্ষ অন্যায়ের উপর অনড় থাকে, আর শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করতে প্রস্তুত না হয়, তা হলে অপরাপর জাতির উচিত অত্যাচারী জাতিকে অন্যায় থেকে নিবৃত্ত করতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। যখন অত্যাচারী পক্ষ তদের বাড়াবাড়ি থেকে বিরত হয়, তখন এই অবস্থায় ইসলাম স্পষ্টভাবে আদেশ দিয়েছে, অন্যায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বা সেই দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করে কখনই যেন প্রতিশোধ না নেওয়া।

কিন্তু কিছু কিছু দেশের দৃষ্টন্ত আমাদের সামনে রয়েছে, যারা যুদ্ধ বিধ্বস্ত জাতিদের এলাকায় হস্তক্ষেপ করে বা শান্তির নামে ঐ সমস্ত পিছিয়ে পড়া দেশগুলোকে সাহায্য করে ঠিকই, কিন্তু নানা অজুহাতে তাদের দেশের সম্পদ কুক্ষিগত করে। শক্তিশালী জাতিসমূহ নিজেদের অর্থ ও সম্পদ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকার পরিবর্তে নিজ শক্তি-বলে দুর্বল দেশগুলির উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে।

যেমন আমি বলেছি, পূর্ব হোক বা পশ্চিম, আর্থিক বা সামাজিক অসাম্যই এই অস্থিরতার মূল কারণ। এই উদ্দেশ্যে জাতি ও দেশসমূহের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য কম করার জন্য সদর্থক চেষ্টা করা আবশ্যক। এছাড়াও রয়েছে সকল প্রকার চরমপন্থা ও গোঁড়ামী।, সেটা ধর্মীয় বা জাতিগত ভিত্তির উপর বা কোনও রকমের হোক। আমাদের সবাই মিলে চেষ্টা করা উচিত এর অবসান করা।

যে সমস্ত দেশের সম্বন্ধে এই বিষয়টি স্পষ্ট সেখানকার লোক কষ্টের মধ্যে আছে। তাদের নেতারা তাদের অধিকার রক্ষা করছেন না। সেখানে শান্তি স্থাপনকারী বিশ্ব-সংগঠন গুলি বিশেষত জাতি সংঘের উচিত আইনের বেষ্টনীতে থেকে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের অধিকার রক্ষা ও সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য বৈধ ও সমুচিত চাপ সৃষ্টি করা।

ইসলাম সম্পর্কিত যতদূর সম্ভব, কারো মনে এই ধারণা সৃষ্টি হতে পারে, মুসলমান দেশগুলি তো নিজেরাই কয়েক বৎসর থেকে মতবিরোধ ও অস্থিরতার শিকার। তাহলে ইসলাম আবার শান্তি স্থাপনে উল্লেখযোগ্যরূপে কী শিক্ষা দিতে পারে? তবে এর উত্তর এই যে, ঐ সমস্ত মুসলমান দেশগুলির এই দুর্ভাগ্য জনক অবস্থা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণেই।

ইসলামী পদ্ধতিতে সরকার ও নেতৃত্বের প্রকৃত ছবি দেখতে ও বাস্তবতা জানার জন্য আমাদের ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আকদস মহম্মদ (সা.)-এর কল্যাণময় যুগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। মদিনা থেকে হিজরত করার পর তিনি (সা.) ইহুদীদের সাথে চুক্তি করলেন। সে অনুসারে মুসলমান ও ইহুদী নাগরিকরদের একে অপরের সাথে শান্তির সাথে ও পারস্পরিক সহানুভুতি, সহনশীলতা ও সাম্যের প্রেরণা সঞ্চারের মাধ্যমে মিলে মিশে বসবাস করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এই চুক্তি মানুষের অধিকার রক্ষা ও ন্যায়ের পদ্ধতিতে রাষ্ট্র বিরাট বিক্ষিপ্ত মুক্তোর মত প্রমাণিত হয়েছিল, যা মদিনায় বসবাসকারী বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি সুনিশ্চিত করেছিল। এই চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে একে অপরের অধিকারের প্রতি যত্নবান থাকা সমস্ত মানুষের কর্তব্য ছিল। মনে রাখা অবশ্য কর্তব্য ছিল। ধর্মীয় স্বাধীনতা ও অভিব্যক্তির স্বাধীনতা এই চুক্তির মূল ভিত্তি ছিল।

ঐক্য এই চুক্তির ভিত্তি ছিল, কেননা তদনুযায়ী মদীনার উপর আক্রমণের পরিস্থিতিতে মুসলমান ও ইহুদীদের সম্মিলিত হয়ে প্রতিরোধ করা আবশ্যক ছিল। এছাড়া নিজেদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রথা অনুযায়ী সমাধান করার অধিকারও প্রত্যেক জাতির ছিল। ইতিহাস এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, নবী করীম (সা.) এই চুক্তির প্রতিটি শর্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেছিলেন।

শরণার্থী হিসেবে মুসলমানেরা এই নতুন সমাজের উন্নতিতে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেছিল। আর মদীনার নাগরিকদের অধিকারের প্রতি যত্নবান ছিল। সুতরাং এই সমাজ বিভিন্ন জাতির ঐক্য ও কৃষ্টির ঐক্যতানের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। মদীনা চুক্তি প্রকৃতপক্ষে কুরআনের শিক্ষার মূলনীতি অনুযায়ী ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ কুরআন করীমের সূরা আন নহলের ৯১ নং আয়াতে খোদা তা'লা বলেছেন, "আল্লাহ্ নিশ্চয় সুবিচার ও উপকার সাধন করিবার এবং আত্মীয়স্বজনকে (দান করিবার ন্যায় অন্য লোকদিগকেও) দান করিবার আদেশ দিতেছেন।"

কিন্তু কুরআন করীম মানুষ ও জাতির সাথে সামাজিক রীতিনীতি ও আচরণের তিনটি ধাপ উপস্থাপন করেছে।

প্রথম ও সবচেয়ে নীচের ধাপ ন্যায় বিচার। যার অধীনে প্রত্যেকের সাথে ন্যায়পরায়ণতা ও সহনশীলতার আচরণ করার

প্রয়োজনীয়তার প্রতি কুরআন করীম নির্দেশ করেছে। ন্যায়পরায়ণতার এই মানের উল্লেখ কুরআন করীমের সূরা নিসার ৩৬ নং আয়াতে আছে।

আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে দৃঢ়ভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকারী হও, এমনকি সেই সাক্ষ্য তোমাদের নিজের বা পিতামাতার এবং নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে গেলেও। (যার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে) সে ধনী হোক অথবা দরিদ্র হোক, আল্লাহ্ ই উভয়ের সর্বোত্তম অভিভাবক। অতএব তোমরা যাতে ন্যায়বিচার করতে (সক্ষম) হও (সেজন্য) তোমরা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর তোমরা যদি পেঁচানো কথা বল অথবা (সত্যকে) এড়িয়ে যাও তাহলে (মনে রেখ) তোমরা যা কর সে সম্পন্ধে আল্লাহ্ নিশ্চয় পুরোপুরি অবহিত।"

অতএব কুরআন করীম অনুসারে ন্যায়পরায়ণতার দাবি এটা, এক ব্যক্তি সাক্ষী দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। যদিও সে তার বিরুদ্ধে হোক বা তার আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে, যাতে সত্যের জয় হয়।

সমাজিকতার দ্বিতীয় ধাপ যা কুরআন করীমে বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা এই, এক ব্যক্তি না শুধু ন্যায়পরয়ণ হবে, বরং এরও অধিক অপরের সাথে স্নেহশীল বা উদারতাপূর্ণ আচরণ করবে। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমার বক্তৃতায় বলেছি কুরআন করীম এই শিক্ষা দেয়, যখন তোমরা একটি অন্যায়কারী জাতিকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখতে কৃতার্থ হয়ে যাও, তখন প্রতিশোধ নিও না। না তাদের উপর অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করো।

বরং তোমাদের উচিত, তাদের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করতে এবং মৌলিক সুযোগ সুবিধা সরবরাহ করতে তাদেরকে সাহায্য করা। যেথায় এই উপায়ে তাদের লাভ হবে, সেখানে ভবিষ্যতে তোমাদেরও লাভ হবে। যদি ঐ সমস্ত দেশ যারা যুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে, অর্থনৈতিক দিক থেকে দৃঢ় ও স্থিতিশীল হয়ে যায়, তাহলে তারা হতাশা ও বঞ্চনার কারণে নিজেদের মধ্যে অন্যান্য দেশের প্রতি ঘৃণার ও বিদ্বেষ জন্ম নিতে দিবে না। না সেখানকার লোক হিজরত করতে বাধ্য হবে।

এটা সেই বিজ্ঞতা যা ইসলামী শিক্ষায় অন্তর্নিহিত। মৌলিক ন্যায় ও বিচার দেওয়ার পর আরও অনুগ্রহপূর্ণ ও কোমল আচরণ করা উচিত।

সমাজের তৃতীয় ধাপের মান যা কুরআন করীমে শেখানো হয়েছে, সেটা এই যে, অপরের সাথে এমন আচরণ করা যেমন মা নিজ সন্তানদের প্রতি সহজাতভাবে স্নেহ করে থাকেন। এই খাঁটি স্নেহ-ভালবাসা কোনও রকম পুরস্কারের প্রত্যাশায় করে না। অপরের সাথে একজন মায়ের স্নেহ-ভালবাসার মত খাঁটি হয়ে অনুগ্রহপূর্ণ উদ্দেশ্যে আচরণ করা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু এই মানদণ্ডের প্রতি সর্বদা আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত।

মোটকথা শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে মুসলিম দেশগুলি হোক বা আন্তজাতিক স্তরে, এটা আবশ্যক যে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ন্যুনতম ন্যায়-বিচারের দাবি পূর্ণ করা যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সমান অধিকার পায় ও ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে গিয়ে ন্যায় ও বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়। অধিকন্তু আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন জাতিসংঘ প্রত্যেক দেশের সাথে যেন সমান ব্যবহার বজায় রাখে। সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির মীমাংসা করতে কিছু প্রতিপত্তিশালীদের স্বার্থে যেন এক দিকে আকৃষ্ট না হয়ে যায়। এটা শান্তি অর্জনের জন্য আবশ্যক। আর এর উপর কার্য-সম্পাদন করে আমরা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি। এটা মানব জাতিকে ভয়ানক ধ্বংস থেকে বাঁচানোর একমাত্র পথ।

এই কয়েকটি কথা বলে আমি দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বে প্রকৃত শান্তি স্থাপন করুন। আল্লহ্ করুন যুদ্ধ-দাঙ্গার ভয়াবহ ছায়া যা ক্রমশ ঘনীভুত হচ্ছে, শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধির আলোকে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আমার দোয়া এই যে, নিরাশা ও বঞ্চনার অবসান হোক, যে কারণে অসংখ্য মানুষ অস্থিরতার সম্মুখীন। সে কারণে বিশ্ব ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের পরিবেষ্টনে সমাচ্ছন্ন।

আমার দোয়া এই, অপরের উপর কর্তৃত্ব করার ও শুধু নিজের অধিকার রক্ষা করার পরিবর্তে দেশ ও তাদের প্রধান প্রধান নেতারা যেন সেই সব কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করে, যা একে অপরের অধিকার প্রদানের দ্বারা অর্জিত হবে। আমি দোয়া করি, বিশ্বের যাবতীয় সমস্যার দায় এক বিশেষ ধর্ম বা জাতিকে না চাপিয়ে আমরা যেন একে অপরের ধর্মবিশ্বাস ও রীতি-নীতি সম্বন্ধে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করি। সমাজে বিদ্যমান ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সমন্বয়কে সম্মান ও শ্রদ্ধা করি। আমি দোয়া করি, আমরা যেন মানবতার সর্বোত্তম মূল্যবোধ রক্ষাকারী হই আর নিজ সন্তানদের জন্য এক উন্নত সমাজ গঠনে একে অপরের গুণাবলী ও নৈপুণ্যতাকে কাজে লাগিয়ে শান্তির নিবাস গড়ে তুলি। নতুবা এর বিপরীতে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, যা কল্পনা করাও অত্যন্ত কষ্টদায়ক।

ইতিপূর্বে আমি অনেক বিশেষজ্ঞদের মতামত বর্ণনা করেছি যা আণবিক যুদ্ধ ও বিশ্বে অস্ত্র প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে সতর্ক করে নিজেদের আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। এই প্রবন্ধাবলী ও ঐ রকম আরও অনেক প্রবন্ধাবলী এই বিশ্লেষনকে সমর্থন করে যে বিশ্ব অত্যন্ত দ্রুততার সাথে এক ভয়াবহ বিনাশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এমন বিনাশ যা মানুষ ইতিপূর্বে কখনও দেখে নি আর যা প্রতিহত করা সম্ভব হবে না।

এক নিরীক্ষণ অনুযায়ী আণবিক যুদ্ধ পৃথিবীর নববই শতাংশ ভূখণ্ডের উপর প্রভাব ফেলবে। আর যদি আণবিক যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাহলে আমরা কেবল বর্তমান বিশ্বের ধ্বংসের জন্য দায়ী হব না, বরং নিজ পশ্চাতে রেখে যাব বিনাশলীলার এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব। সুতরাং আমাদের উচিত, একটু থেমে গিয়ে নিজ চিন্তাধারা, সিদ্ধান্ত ও কর্মসমূহের ভয়াবহ পরিণতির নিয়ে চিন্তা করা।

আমাদের কোন বিষয়কে যেটি কোনও দেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বা আন্তর্জাতিক প্রকারের হোক, সাধারণ বোধ করা উচিত নয়। আমরা অর্থনৈতিক বিষষের সমাধান করছি বা শরণার্থী সমস্যার সমাধান খুঁজছি বা আর কোনও সংকট বিবেচনাধীন থাকুক, আমাদের ধৈর্য সহকারে প্রচেষ্টা চালিয়ে ঐ সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূর করা উচিত যা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। আমাদের সর্বশক্তি ও বল শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্যয় করা উচিত। আমাদের ঝগড়া-বিবাদ শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করা উচিত। পরস্পর বৈঠক করে আলোচনা ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করা উচিত। একে অপরের অধিকার প্রদান ও রক্ষার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত করা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদিগকে এরূপ করার তৌফিক দান করুন। আমীন। এই কথার সাথে আমি সব অতিথিবৃন্দকে এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।

[অনুবাদ: মর্তুজা আলি, বড়িশা]

যুগ খলীফার বাণী

যদি তোমরা ইহকাল ও পরকালের সফলতা এবং মানুষের মন জয় করতে চাও, তবে পবিত্রতা অবলম্বন কর, নিজেকে পরিছন্ন রাখ এবং নিজের উত্তম আচরণের নমুনা প্রদর্শন কর। তবেই তোমরা সফলকাম হবে। (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১লা জানুয়ারী, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Berhampore (MSD)

ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তরবারির জিহাদ না করার কারণসমূহ

মূল: (উর্দু) হযরত মৌলানা জালালুদ্দিন শামস (রা.) অনুবাদ: কাযী মহম্মদ আয়ায,মুয়াল্লিম সিলসিলা

হযরত মৌলানা জালালুদ্দিন শামস সাহেবের এই উচ্চকোটির প্রবন্ধটি রূহানী খাযায়েনের ১৭তম খণ্ড থেকে নেওয়া হয়েছে। যা তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রণীত 'গভর্ণমেন্ট আংরেজি অউর জিহাদ' নামক পুস্তিকার ভূমিকা স্বরূপ এই প্রবন্ধটি রচনা করেছেন।

এই পুস্তিকা ১৯৯০ সালের ২২শে মে মুদ্রিত হয়। এই পুস্তিকায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) জেহাদের সত্যতা এবং এর দর্শন বর্ণনা করেছেন। এবং কোরআন, হাদীস ও ইতিহাসের আলোকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, ইসলামের প্রথম যুগে বাধ্য হয়ে মুসলমানদের যে যুদ্ধ করতে হয়েছিল তা ছিল কেবলমাত্র সাময়িক ও প্রতিরোধমূলক এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। নতুবা ইসলামের চাইতে সন্ধি ও সম্প্রীতিকামী এবং শান্তি ও নিরাপত্তার ধ্বজাবাহী ধর্ম আর নেই। হযরত আকদাস (আঃ) তাঁর বিভিন্ন রচনায় জেহাদ সম্পর্কে ধর্মীয় নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করেছেন এবং এর কারণ এটাই যে, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীতে সকল ধর্মের উপর চূড়ান্ত যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করা এবং ইসলামের বিজয় নিশ্চিত করা। এবং পাশ্চাত্যের দার্শনিক ও প্রাচ্যের উলামাদের ইসলামের উপর সবচেয়ে বড় আপত্তি এটাই ছিল যে, ইসলাম তলোয়ারের দ্বারা বিস্তারলাভ করেছে এবং ধর্মীয় ব্যাপারে বল প্রয়োগকে প্রশ্রয় দিয়েছে। সুতরাং লন্ডনের পাদরী মিলকম মিকাল এর ইংরেজী পুস্তক **'দি টোয়েন্টিথ সেঞ্চুরী'** ডিসেম্বর ১৮৭৭, ৮৩২ পৃষ্ঠায় লিখেছে:-

কোরআন করীম দুনিয়াকে দু'ভাগে ভাগ করে। **'দারুল ইসলাম'** অর্থাৎ **'ইসলামী রাজত্ব** এবং **'দারুল হারব'** অর্থাৎ **'দুশনের রাজত্ব'**। যে সমস্ত লোক মুসলমান নয় সবাই ইসলাম বিরোধী। অতএব সত্যিকার মুসলমানের অবশ্যই কর্তব্য সে যেন কাফেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না সে ইসলাম কবুল করে নেয় অথবা খুন হয়ে যায়, যাকে জেহাদ বা জঙ্গে মোকাদ্দস বলে। যার সমাপ্তি শুধুমাত্র সেই অবস্থায় হতে পারে, যদি দুনিয়ার সমস্ত কাফের ইসলাম কবুল করে নেয় অথবা তাদের প্রত্যেকে মারা যায়। সুতরাং ইসলামের খলিফার পবিত্র কর্তব্য এই যে, 'যখন সুযোগ আসে তখন যেন অমুসলিম বিশ্বের সাথে জেহাদ করে"। (আনুবাদ ইংরেজী)

১৮৮৭ সালে লন্ডন থেকে মুদ্রিত স্যার উইলিয়াম মুর রচিত **'Life of Muhammad'** এর ৫৩৩ পৃষ্ঠায় লেখেন যে,

"Intolerance quickly took the place of freedom, force of Pursuasion ..... Saly the unbelievers where soever ye find them ; was now the watchword of Islam." অর্থাৎ ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা স্বাধীনতার স্থান দখল করেছে আর জবরদস্তি (অত্যাচার) স্থান নিয়েছে প্রেরণার। এবং ইসলামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বর্তমানে এই বুলিতে পরিণত হয়েছে যে, "যেখানে পাও কাফির নিধন কর"।

এবং মেজর আসবার্ন তাঁর **'Islam under the Arab Role'** পুস্তকে জেহাদ সম্পর্কে অনুমান সাপেক্ষে লিখেছেন- "যখন তাঁকে [হযরত মহম্মদ (সাঃ)]-কে কষ্ট দেওয়া হত তখন তিনি যে নীতি নির্ধারণ করেছিলেন তার মধ্যে এটাও ছিল যে, ধর্মীয় ব্যাপারে কোন বলপ্রয়োগ হওয়া উচিত নয় .....। কিন্তু সাফল্যের উন্মাদনা তাঁর উত্তম চিন্তা-ভাবনার কণ্ঠকে বহু কাল পূর্বে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। তারা যুদ্ধের এক সার্বজনীন নির্দেশ বলবৎ করেছিল (যার ফল এই ছিল) যে, আরবের বাসিন্দারা এক হাতে কোরআন আর অন্য হাতে তলোয়ার নিয়ে প্রজ্বলিত শহরের অগ্নিশিখা এবং বিধ্বস্ত ও বিপন্ন পরিবারগুলির করুণ আর্তনাদের মধ্যে নিজেদের ধর্মের প্রসার করেছে"। (অনুবাদ ইংরেজী)

('ইসলাম আন্ডার দি আরব রোল' লাংগম্যানগ্রেন এ্যান্ড কোম্পানী লন্ডন, পৃষ্ঠা : ৪৬)

যেহেতু পশ্চীমারা জেহাদের প্রকৃত সত্যতা না বোঝার কারণে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীকে মারাত্মক-ভয়াবহ রূপে উপস্থাপন করেছিল সেইজন্য হযরত আকদাস (আঃ) তাঁর বিভিন্ন রচনাবলীতে জেহাদ সংক্রান্ত ধর্মীয় নীতি আলোচনা করেছেন, এবং এর সত্যতা প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও এ বিষয়ের অন্যান্য কারণগুলি সম্পর্কেও বারংবার লেখা হয়েছে:

(১) তাঁর দাবি মসীহ্ মাওউদ ও মাহ্দী মা'হুদ হওয়ার ছিল আর মুসলমানদের এই ধারণা ছিল যে, যখন মসীহ্ মাওউদ ও মাহ্দীর আবির্ভাব হবে তিনি কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করবেন আর তরবারির জোরে ইসলামের প্রসার ঘটবে। অতএব ইমাম নাওবী হাদিস ইয়াযাউল জিযিয়ার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখেন-

"وامّا قوله صلى الله عليه وسلم يضع الجزية و الصواب فى معناه انه لا يقبلها و لا يقبلها من الكفار الّا الاسلام، و من بذل منهم الجزية لم يكف عنه بها بل لا يقبل الّا الاسلام او القتل هٰكذا قال الامام ابو سليمان الخطابى وغيره من العلماء"

অর্থাৎ রসূল (সাঃ)-এর এই নির্দেশ যে, হযরত ঈসা (আঃ) জিযিয়া বিলোপ সাধন করবেন, এর সঠিক তাৎপর্য এটাই যে, তিনি জিযিয়া গ্রহণ করবেন না, কাফিরদের নিকট হতে শুধুমাত্র তাদের ইসলামকে মেনে নেওয়া গ্রহণ করবেন। আর তাদের মধ্য হতে যারা নিজেরা জিযিয়া দিয়ে নিজেদের মুক্ত করতে চায় তা তাদের থেকে গ্রহণ করা হবে না, বরং মসীহ্ (আঃ) কেবলমাত্র তাদের ইসলাম কবুল করাকেই গ্রহণ করবেন। আর যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তাকে হত্যা করা হবে। ইমাম আবু সুলায়মান খাত্তাবি প্রমুখ উলামারা বলেন, আঁ হযরত (সাঃ)-এর **'ইয়াযাউল জিযিয়া'**র এটাই প্রকৃত তাৎপর্য যা বর্ণিত হয়েছে"।

(আরও দেখুন ফাতহুল বারীর ব্যাখ্যা লা ইবনে হাজার আসকালানী, ২য় অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩১৫)

অনুরূপভাবে মাওলানা সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী তাঁর পুস্তক **'হেজাজুল কেরামা'**র ৩৭৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত, প্রকাশক ভোপাল শহরে অবস্থিত শাহ্জাহানী ছাপাখানা, আর তাঁর পুত্র নবাব মৌলবী নুরুল হাসান খান সাহেব তাঁর **'ইকতারাবুসসায়াত'** নামক পুস্তকে মাহ্দী মা'হুদের যুদ্ধ সম্পর্কে লেখেন- "ভূপৃষ্ঠে (পৃথিবীর) সমস্ত বাদশাগণ আনুগত্যের অধিনস্থ হবে। মাহ্দী তাঁর এক সৈন্যবাহিনী হিন্দুস্তানের দিকে প্রেরণ করবে। এখানকার বাদশাকে গলাধাক্কা দিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত করা হবে। হিন্দুস্তানের সমস্ত ধন-সম্পদ বায়তুল মোকাদ্দসে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ঐ সব ধন-সম্পদ বায়তুল মোকাদ্দসের তালিকাভূক্ত হবে। বহু বছর পর্যন্ত মাহদী এরূপ অবস্থায় থাকবে। **('ইকতারাবুসসায়াত'**, পৃষ্ঠা: ৮০, মুদ্রণ ১৩০৯ হিজরী, প্রকাশক-সাঈদুল মাতাবী বেনারস)

সুতরাং ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট **প্রথমত** মুসলমানদের ঐ বিশ্বাস অনুযায়ী যে, 'মসীহ্ মাওউদ ও মাহদী মা'হুদ তরবারির জোরে কাফিরদের (অস্বীকারকারীদের) মুসলমান বানাবে অথবা তাদেরকে হত্যা করবে', জামাতে আহ্মদীয়ার প্রতিষ্ঠাতাকে তাঁর মসীহিয়ত ও মাহদীয়ত দাবির কারণে সন্দেহের চোখে দেখত।

(২) দ্বিতীয়ত এই কারণে যে, তাঁর মাহ্দী দাবির কয়েক বছর পূর্বে 'মাহদী সুডানী' (১৮৭১-১৮৮২)-

তে মাহদী হওয়ার দাবি করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সুডানে জেহাদ ঘোষণা করে লড়াই,হানাহানি ও দাঙ্গার পরিবেশ রচনা করেছিল এবং পরিশেষে ১৮৮২ সালে পরাজিত হয়। ইংরেজরা তা ভুলে যায় নি। এই জন্য মাহদী হওয়ার দাবিকারককে ইংরেজ সরকার সুনজরে দেখতে পারত না। আর সহ্যও করতে পারত না।

(৩) তৃতীয় কারণ এই যে, কিছু উলামা তাঁর বিরুদ্ধে ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছিল এবং সরকারকে মাহ্দী সুডানীর সময়কে স্মরণ করিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ইন্ধন জোগাচ্ছিল। সুতরাং মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটলবীর তো এটাই পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি তাঁর পত্রিকা **'ইশাআতুস্‌সুন্নাহ্'**তে লেখেন- "সরকারকে এটা বিশ্বাস করা সঙ্গত নয় আর তাঁর থেকে সাবধান হওয়া প্রয়োজন নইলে ঐ কাদিয়ানী মাহদী কর্তৃক এমন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে যা মাহ্দী সুডানীর দ্বারা হয় নি"। ('ইশাআতুস্‌সুন্নাহ্', ১৬তম খণ্ড, ৬ নম্বর টীকা, পৃষ্ঠা : ১৬৮, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)

(৪) চতুর্থ কারণ, পাদরীগণ, যারা মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রমাণ সমূহের কারণে মোকাবেলা করতে অসমর্থ হয়ে পড়েছিল তারা নিজেদের পরাজয়ের প্রতিশোধ এই ভাবে নেওয়া সহজ মনে করেছিল যে, ইংরেজ সরকার যারা তাদের অনুরূপ ধর্মীয় মতাদর্শে বিশ্বাসী, তাঁকে নিন্দা, কুৎসা করে বন্দী বানাবে অথবা তাঁর প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করে ইসলামের প্রচার বিরত রাখবে। সুতরাং পাদরী হেনরী মার্টিন ক্লার্ক এই হত্যার চেষ্টা সংক্রান্ত মোকদ্দমায়, যা তাঁর বিরুদ্ধে পাদরীদের ষড়যন্ত্রে খাড়া করা হয়েছিল, শপথ পূর্বক সাক্ষী দিয়েছিলেন যে, "মির্যা সাহেব সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মতামত এটাই যে, তিনি একজন খারাপ, দাঙ্গাবাজ এবং ভয়ঙ্কর ব্যক্তি, ভালো নয়। (রুহানী খাযায়েন, ১৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২০০)

পাদরী হেনরী মার্টিন ক্লার্ক ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে অবাধে মিলত এবং তাদের সাথে খাওয়া দাওয়া, উঠাবসা করত। ইংরেজ সরকারের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নাম করতে থাকত। এবং অনুরূপভাবে অন্য পাদরী ইমাদ উদ্দিন প্রমুখ ও তাদের নিজ লেখনীতেও এই ধরনের অপবাদ আরোপ করত।

(৫) পঞ্চমত তাঁর দাবির সময়টা সেটাই ছিল, যখন কিনা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের অল্পকাল অতীত হয়েছিল। এই বিদ্রোহে যদিও হিন্দু ও মুসলমান অংশ গ্রহণ করেছিল কিন্তু হিন্দুরা এই বলে নিজেদেরকে আলাদা করে নিল যে, আসলে মুসলমানরা পুণরায় রাজত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এই বিদ্রোহের সূচনা করেছে। এবং হযরত আকদাস, যিনি আহ্মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা, খোদাতা'লার নির্দেশে মাহদী হওয়ার দাবি করেছিলেন। ইংরেজদের দৃষ্টিতে যার অর্থ বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছু ছিল না। দ্বিতীয়ত তিনি ছিলেন মুঘল বংশ বৃক্ষের একটি শাখা, যাদের রাজত্বের পতন ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের হাতে হয়েছিল। সেই কারণে তাঁর সম্পর্কে ইংরেজদের এই ধারণা অমূলক ছিল না যে, তিনি মাহদী হওয়ার দাবি এজন্য করেছেন, যেন তাঁর বংশের হারিয়ে যাওয়া গৌরব ও রাজত্ব পুনরায় ফিরিয়ে আনেন। বিশেষ করে যখন কিনা মৌলবী এবং পাদরীরাও রাত-দিন তাঁর বিরুদ্ধে সরকারকে উত্তেজিত করার কাজে রত থাকত এবং গোপন সংবাদের মাধ্যমে সরকারকে তাঁর বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলার চেষ্টা চালিয়ে যেত। এই সমস্ত কারণে হযরত আকদাসকে তাঁর নিজ রচনাবলীতে একাধিকবার **'জেহাদ'** সম্পর্কে মুসলমানদের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির খণ্ডন করা এবং জেহাদের বাস্তবিকতা বর্ণনা করা এবং সরকারের প্রতি নিজ দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করার জন্য এই প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে তাঁর পরিবার সরকারের প্রতি যে কর্তব্য পালন করেছিল তা বারংবার বর্ণনা করার কারণও এটাই ছিল এবং এটা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল যে, যদি মাহদী দাবি করার উদ্দেশ্য তাঁর বংশের হারিয়ে যাওয়া জমিদারী (শাসন ক্ষমতা) ফিরিয়ে আনা হত তাহলে তাঁর পরিবার সেই সময় তাদের সাহায্য কেন করত যখন কিনা ইংরেজরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত ছিল?

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তরবারীর জেহাদ না করার কারণ

তিনি (আঃ) ইংরেজদের বিরুদ্ধে তরবারীর জেহাদকে এইজন্য অবৈধ করেছেন যে, ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে সরকার শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে, পূর্ণরূপে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করে এবং মুসলমানদের সম্পদ ও জীবন রক্ষা করে, এমন সরকারের বিরুদ্ধে তরবারীর জেহাদ করা বৈধ নয়। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকারের তোষামোদ করার অপবাদকারীদের সম্বোধন করে বলেন : "হে অজ্ঞের দল! আমি এই গভর্নমেন্টকে কোন তোষামোদ করি না বরং আসল কথা এটাই যে, যে সরকার ইসলাম ধর্ম ও ধর্মীয় রীতিনীতিতে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করে না এবং নিজেদের ধর্মের অগ্রগতি প্রদানের জন্য আমাদের উপর তলোয়ার চালায় না। কোরআন শরীফের দৃষ্টিতে তাদের বিরুদ্ধে ধর্মীয় যুদ্ধ করা হারাম (অবৈধ)। কেননা তারাও কোন ধর্মীয় জেহাদ করে না"। (কিশতিয়ে নূহ, রুহানী খাযায়েন, ১৯তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৫, টীকা পৃষ্ঠা : ৬৯)

আরও বলেন, "ইসলামী শরীয়তের এটি স্পষ্ট নীতি, যার উপর সমস্ত মুসলমানের মতৈক্য আছে যে, যার ছায়াতলে মুসলমানরা শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করে এবং যাদের দানশীলতার প্রতি কৃতজ্ঞ, যাদের কল্যায়ময়ী রাজত্ব প্রকৃতপক্ষে নেকী আর হেদায়েত বিস্তারের জন্য সম্পূর্ণ সাহায্যকারী, এমন শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জেহাদ করা নিশ্চিতরূপে অবৈধ"।

(মজমুয়ায়ে ইশতেহারাত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬৬)

এবং এই ধর্মই ছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোজাদ্দিদ হযরত সৈয়েদ আহমদ বেরেলোবী (রহঃ)র। মওলানা জাফর থানসিরী (মৌলানা মহম্মদ মওলানা জাফর থানসিরী সম্পর্কে মওলানা মহম্মদ আলী জলন্ধরী লেখেন যে, হিন্দুস্থানের ইতিহাসে এবং রাজনীতিতে কোন ছাত্র আছে যারা কিনা মওলানা জাফর থানসিরী, মওলানা ফযল হক হায়রাবাদীর নাম এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের প্রচেষ্টার ব্যাপারে অজ্ঞাত। আযাদ ১৭এপ্রিল, ১৯৫০ সোয়ানেহ আহমদী পুস্তকের রচয়িতা লেখেন যে, একজন প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেন আপনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যারা কিনা ইসলাম ধর্ম অস্বীকারকারী (অমান্যকারী) এবং যারা এই দেশের শাসনকর্তা, জেহাদ করে হিন্দুস্থানকে নিয়ে নিচ্ছেন না কেন? তিনি (আঃ) বলেন, " ইংরেজ সরকার ইসলাম অমান্যকারী ঠিকই কিন্তু তারা মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও সীমা লঙ্ঘন (অবিচার) করে না আর না তাদেরকে আবশ্যকীয় ধর্মীয় রীতিনীতি পালনে ও উপাসনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আমরা তাদের ভূখণ্ডে প্রকাশ্যে সর্বসমক্ষে বক্তৃতা করি আর প্রভাব বিস্তার করি, তারা কোন দিন বারণ ও বাধা প্রদান করে নি।..... আমাদের আসল কাজ আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রচার এবং হযরত মহম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নতকে পুনরুজ্জীবিত করা। অতএব সেগুলি আমরা অবাধে এই ভূখণ্ডে করে থাকি। তাহলে আমরা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কি কারণে জেহাদ করব এবং ইসলামী নীতির বিরুদ্ধে বিনা কারণে উভয় পক্ষ রক্ত ঝরাবো? এই যুক্তিপূর্ণ উত্তর শুনে প্রশ্নকারী নীরব হয়ে গেলেন এবং জেহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন। (সয়ানেহ্ আহমদী

ইমামের বাণী

তোমাদের আদর্শ তারা যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, কোনও ব্যবসা বা কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিরত রাখে না।" (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৬)

দোয়াপ্রার্থী: **Shamsher Ali, Amir Birbhum District**

যুগ ইমামের বাণী

"তোমাদের আদর্শ সেই সমস্ত মানুষ যাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, কোন ব্যবসা ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর থেকে বাধা দেয় না।" (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৬)

দোয়া প্রার্থী: **Abdur Rehman Khan, (Manager Lilly Hotel)**

ক্লাঁ পৃষ্ঠা : ৭১)

এবং ১৩৯ পৃষ্ঠায় লেখেন "ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সৈয়্যেদ সাহেবের মোটেই জেহাদের অভিপ্রায় ছিল না। তিনি এই অবাধ বিচার ব্যবস্থাকে (নীতিকে) নিজের বিচার ব্যবস্থা (নীতি) মনে করতেন"।

অনুরূপভাবে তাঁর এক প্রবল সমর্থক, যোগ্য ছাত্র হযরত মওলানা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) কলকাতায় থাকাকালীন যখন তিনি তাঁর বক্তব্য প্রদান করছিলেন, তাকে এই প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ করা যথার্থ কি না? তিনি উত্তরে জানান "এমন প্রজা-হিতৈষী ও নিরপেক্ষ সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার জেহাদ করা যথার্থ নয়"। (সয়ানেহ্ আহমদী ক্লা পৃষ্ঠা : ৫৭)

এবং স্যার সৈয়েদ আহমদ খান তাঁর নিজ পুস্তিকা 'রেসালাহ্ বাগাওয়াতে হিন্দ্'-এ .দলিলসহ প্রমাণ করেছেন যে, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ জেহাদ ছিল না আর না ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ধর্মীয় বিধান সম্মত ছিল।

অনুরূপভাবে মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালোবী একটি প্রবন্ধ (পুস্তক) **'আল ইকতাসাদ ফি মাসাইলু জেহাদ'** ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন আর ইসলামী পণ্ডিতদের মতামত জানার জন্য তিনি লাহোর থেকে শুরু করে আজীমাবাদ ও পাটনা পর্যন্ত ভ্রমণ করেন আর ইসলামের বিভিন্ন ফিরকার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত মতামত সংগ্রহ করেন। সেখানে তিনি দলিল বর্ণনা করে লেখেন-

"এই দলিল থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, ভারতবর্ষ খ্রীষ্টান শাসন ব্যবস্থার অধীনে থাকা সত্বেও শান্তির দ্বার। এই ভূমিতে কোন বাদশাহের, সে আরবের অথবা আরব ছাড়া অন্য কোন দেশের, মাহদী সুডানী হোক অথবা হযরত সুলতান শাহ্ ইরানী, যদি সে খোরাসনের আমীর ও হয় তবুও ধর্মীয় যুদ্ধ ও আক্রমণ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ"।

(আল ইকতেসাদ, পৃষ্ঠা : ১৬)

আর লেখেন - "ইসলামের অনুসারীদের হিন্দুস্থানের জন্য ইংরেজ সরকারের বিরোধীতা ও বিদ্রোহ করা হারাম (নিষিদ্ধ)"। (ইশাআতুসসুন্নাহ্ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১০ নম্বর, পৃষ্ঠা : ১৮৭)

আরো লেখেন - "ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হতে এই নিরাপত্তা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সুন্দর বিচার ব্যবস্থাপনার আওতায় হিন্দুস্থানের আহ্লে হাদীস সম্প্রদায় ব্রিটিশ রাজত্বকে প্রবলভাবে আশীর্বাদ মনে করত। ইসলামী সাম্রাজ্যগুলি অপেক্ষা এই সাম্রাজ্যের শাসনাধীন থাকা অধিক শ্রেয় মনে করত আর সে যেখানে খুশি থাকুক (আরবে হোক অথবা রোমে বা অন্যত্র) অন্য কোন সাম্রাজ্যের অধীনে থাকতে নারাজ।

(ইশাআতুসসুন্নাহ্, নাম্বার ১০, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৯৩)

এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি নবাব মৌলবী সিদ্দীক হাসান খান ভূপালী ও মৌলবী নযীর হোসেন মোহাদ্দিস দেহলবীর ছিল। আর এই ফতোয়া মৌলবী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী আর মৌলবী আশরাফ আলী থানবী সাহেব প্রমুখ দিয়েছেন যে, "ইংরেজ সরকারের বিরোধীতা করা মুসলমানদের জন্য শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম (নিষিদ্ধ)।"

(দেখুন "নুসরতুল আবরার" ১৩০৬ হিজরী)

এবং **'যমিনদার'** পত্রিকার সম্পাদক মওলানা জাফর আলী খানও হিন্দুস্থানকে শান্তির দ্বার বলে অভিহিত করতে গিয়ে লেখেন- "যমিনদার ও তার পাঠকবর্গ ইংরেজ সরকারকে খোদার ছায়া জ্ঞান করত এবং রাজকীয় দান ও শাহী বিচারকে আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে বাদশাহ্র কপালের এক বিন্দু ঘাম ঝরার পরিবর্তে নিজেদের শরীরের রক্ত ঝরানোর জন্য প্রস্তুত আর এরকমই অবস্থা হিন্দুস্তানের প্রতিটি মুসলমানের।" (যমিনদার, ৯নভেম্বর ১৯১১খ্রী:)

আর লেখেন : "মুসলমান এক মুহূর্তের জন্য এমন রাজত্বের (শাসনতন্ত্রের) প্রতি বিরাগভাজন হওয়ার কথা মনে করতেই পারে না। যদি কোন দুর্ভাগা মুসলমান সরকারের বিরুদ্ধে এতটুকুও (বিন্দুমাত্র) বিদ্রোহ করে তাহলে আমি একথা অকপটে বলতে পারি যে, সেই মুসলমান মুসলমানই নয়।" (যমিনদার, ৯নভেম্বর ১৯১১খ্রী:)

অনুরূপভাবে উলামা আসসাইদুল হায়েরী মুজতাহিদুল আসর (শিয়া নেতৃবর্গ) ইংরেজ সরকারের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেন- "আমি তো এমন সাম্রাজ্যের ছত্রতলে থাকা পরম সৌভাগ্য মনে করি, যার শাসনামলে নিরপেক্ষতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা আইন রূপে বলবৎ হয় যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোন সাম্রাজ্যে পাওয়া যায় না। উপলব্ধি করে দেখ যে, তোমরা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য কেমন নির্ভয়ে ও নির্বিকারে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আজ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ভাষণ ও ধর্মোপদেশ দিচ্ছ। এবং কেমনভাবে প্রত্যেকটা জিনিস এই কল্যাণময় সময়ে (রাজত্বে) আমাদেরকে খুব সহজলভ্য করা হয়েছে, যার অস্তিত্ব পূর্বের কোন শাসনামলে ছিল না। অতীতের অমুসলিম রাজত্বের সময়ে এমন অবস্থা ছিল যে, মুসলমানরা তাদের মসজিদে আযান পর্যন্ত দিতে পারত না আর অন্য কথা তো দূরঅস্ত। বৈধ জিনিস খাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হত। এ ব্যাপারে যথারীতি আইনানুনাগ কোন তদন্ত হত না। ..... এজন্য আমি বলি যে, প্রত্যেক শিয়াকে ঐ অনুগ্রহের পরিবর্তে (যা ধর্মীয় স্বাধীনতা রূপে তারা প্রাপ্ত হয়েছে) অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ব্রিটিশ সরকারের দয়া প্রার্থনা ও কৃতজ্ঞতা পোষণ করা উচিত এবং এর জন্য শরীয়তেও নিষেধাজ্ঞা নেই। কেননা ইসলামের পয়গম্বর সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া সাল্লাম .....আদিলের শাসনাধীন হওয়ার কথা প্রসংশা ও গর্বের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন।"

(মেয়াযাহ তাহরিফ কোরআন বাবত মাহ্ এপ্রিল.১৯২৩)

অনুরূপভাবে শামসুল উলামা মওলানা নযীর আহ্মদ দেহ্লবী ৫ই অক্টোবর ১৮৮৮ সালে দিল্লির টাউন হলে এক বক্তৃতায় ইংরেজ গভর্নমেন্ট সম্পর্কে বলেন "সরকার কি স্বৈরাচারী ও রক্ষণশীল? তওবা তওবা বাপ-মায়ের থেকে বেশি স্নেহপরায়ণ।"

(মওলানা মৌলবী হাফিয নযীর আহমদ দেহলবীর ভাষণ-সমগ্র, ১৮৯০, পৃ ৯)

আরো বলেন, "ইংরেজ শাসনকালে আমাদের যে স্বাচ্ছন্দ সহজলব্ধ হয়েছে অন্য কোন জাতির তা প্রদানের ক্ষমতা নেই।"

(মওলানা মৌলবী হাফিয নযীর আহমদ দেহলবীর ভাষণ-সমগ্র, পৃ:২৬)

এবং সম্মানীয় ডাঃ স্যার সৈয়্যদ আহ্মদ খান বাহাদুর মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে ইংরেজ সরকার সম্পর্কে বলেন, "ন্যায় বিচারক শাসক (বাদশাহ)-এর কোন প্রজার উপর অভিভাবক হওয়া প্রকৃতপক্ষে নিজ বান্দাদের প্রতি খোদা তা'লার করুণা এবং নিঃসন্দেহে সমস্ত প্রজা ঐ ন্যায় বিচারক রাজার অনুগ্রহ প্রার্থী। সুতরাং আমরা ভারতবর্ষের প্রজাগণ যারা হিন্দ ও ইংল্যাণ্ডের অখণ্ড সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রজা, যিনি আমাদের উপর ন্যায় ও নিরপেক্ষতার সাথে ধর্মীয় ও বর্ণীয় পক্ষপাত ছাড়া রাজত্ব করেন, তাঁর প্রতি আমরা সম্পূর্ণরূপে কৃতজ্ঞ। আর এটা আমাদের পবিত্র ও পূর্ণবিকশিত ধর্মের শিক্ষা। এই সরকারের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা পোষণ করা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা অবশ্য-কর্তব্য।" (মজমুআ লেকচার , ডক্টর স্যার সৈয়্যদ আহমদ খান বাহাদুর১৮৮২, পৃ ১৫)

এবং ১৮৮৬ সালের ১০ই মে আলীগড়ের বক্তৃতায় ইংরেজ সরকারের প্রতি নিজ সহানুভূতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, " আমার উপদেশ এই যে, ইংরেজ গভর্নমেন্টের নিমিত্তে নিজেদের হৃদয় পরিষ্কার রাখ এবং ভদ্র আচরণ কর এবং সর্ব ব্যাপারে গভর্নমেন্টের প্রতি বিশ্বাস রাখ।" (মজমুআ লেকচার , ডক্টর স্যার সৈয়্যদ আহমদ খান বাহাদুর,১৮৯২, পৃ ২৩৯)

সুতরাং ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) উপস্থাপন করেছেন সমস্ত বড় বড় উলামা এই দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক ছিলেন। খাঁটি রাজনীতিজ্ঞ ও ধর্মীয় মুসলিম পথ-প্রদর্শকগণের উল্লিখিত উদ্ধৃতিগুলি ছাড়াও আরও একজন অ-আহ্মদী ব্যক্তির (মালিক মহম্মদ জা'ফর খান এ্যাডভকেট) বর্ণনা উপস্থাপন করাও সমীচীন হবে। মালিক সাহেব লেখেন, " মির্যা সাহেবের সময়ে তাঁর খ্যাতনামা বিরুদ্ধবাদী উদাহরণ স্বরূপ মৌলবী মহম্মদ হোসেন

বাটালবী, পীর মেহের আলী শাহ গুলড়বী, মৌলবী সানাউল্লাহ সাহেব ও স্যার সৈয়্যদ আহমদ খান সকলেই ইংরেজদের এমনই অনুগত ছিল যেরূপ মির্যা সাহেব। কারণ এটাই ছিল যে এই যুগে যে সমস্ত লিটারেচার মির্যা সাহেবকে প্রত্যাখ্যান করতে লেখা হয়েছে সেখানে এই ব্যাপারে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না যে, মির্যা সাহেব তাঁর উপদেশাবলীতে পরাধীনতাকে স্বীকার করে নেওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।" (আহমদীয়া তাহরীক পৃষ্ঠা : ২৪৩)

সারসংক্ষেপ এই যে, তাঁর ইংরেজ রাজত্বের প্রসংশা করা আর তার প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে একটি নিয়মের অধীন ছিল তা এই যে, (১) এই শাসন ব্যবস্থা পাঞ্জাবের মুসলমানদের শিখ শাসকদের প্রচণ্ড অত্যাচার থেকে নিস্কৃতি দিয়েছে। (২) তারা দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। (৩) তারা দেশে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে।

জেহাদ অর্থাৎ তরবারীর যুদ্ধের নিষেধাজ্ঞার আরও একটি কারণ

এরপর তিনি (আঃ) তরবারীর যুদ্ধের নিষেধাজ্ঞা বর্ণণা করতে গিয়ে এই ব্যাপারেও ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এই দেশ ও যুগে এই জন্য তরবারীর যুদ্ধ নিষেধ কারণ জেহাদের রসদ পাওয়া যেত না। সুতরাং তিনি (আঃ) তাঁর রচিত পুস্তক **'হাকীকাতুল মাহদী'** (মাহদীর যথার্থতা)-তে বর্ণনা করেন, ''فرفعت هذه السنّة برفع اسبابها فى هذه الايّام'' অর্থাৎ তলোয়ারের সাথে জেহাদের রসদ না যাওয়ার কারণে বর্তমান যুগে তলোয়ারের যুদ্ধ রহিত। আরো বলেন.

''وامرنا ان نعد للكافرين
كما يعدون لنا ولا نرفع الحسام قبل
ان نقتل بالحسام'' (حقيقة المهدى، روحانى
خزائن جلد 14 صفحه 454)

খাযায়েন ১৪তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৫৪)

আর আমাদের এই নির্দেশ আছে যে, আমরা কাফিরদের (অস্বীকারকারীদের) বিরুদ্ধে সেই রকম প্রস্তুতি গ্রহণ করি যেরূপ প্রস্তুতি তারা আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য গ্রহণ করে অথবা এরূপ যে, কাফিরদের সঙ্গে তদ্রুপ আচরণ কর যদ্রুপ তারা আমাদের প্রতি করে থাকে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমাদের উপর তলোয়ার না উঠায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরাও তাদের উপর তলোয়া না উঠাই।

পুনরায় বলেন,

''وَلَا شَكَّ اَنَّ وُجُوْهَ الْجِهَادِ
مَعْدُوْمَةٌ فِىْ هٰذَا الزَّمَنِ وَ هٰذِهِ الْبِلَادِ''

(তোহ্ফা গুলড়বীয়া, রুহানী খাযায়েন ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৮২) আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, জেহাদের কারণ অথবা রসদ এই যুগে ও এই শহরতলিতে পাওয়া যায় না। এই কথাটাই নবাব মৌলবী সিদ্দীক হাসান খান **'তরজুমান ওয়াহাবীয়া'**-র ২০নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "জেহাদ শরীয়তী রসদ ছাড়া ও ইমামের অস্তিত্ব ব্যতীত কোন ক্রমেই বৈধ নয়।"

এবং মৌলবী জাফর আলী খান লেখেন, "ইসলাম যখন কোন জেহাদের অনুমতি প্রদান করেছে বিশেষ অবস্থার নিরিখে প্রদান করেছে। জেহাদ দেশ জয়ের বাসনা পূর্ণ করার পথ নয়। তার জন্য শর্ত হল প্রাচুর্য । ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা শর্ত। শত্রুদের অগ্রগমন ও সূচনা হল শর্ত।"

(যমিনদার, ১৪ই জুন ১৯২৬)

এবং মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী লেখেন, " শরীয়তী জেহাদের একটা বৃহৎ শক্তিশালী শর্ত এটাই যে, মুসলমানদের মাঝে ইমাম ও যুগ খলিফার উপস্থিত থাকা। মুসলনমানদের মাঝে এমন জোটবদ্ধ আত্মসংযমী দল উপস্থিত থাকা যেখানে তাদের মধ্যে ইসলামের মর্যাদা হানীর ভয় না থাকে আর ইসলামের বিজয় ও সাফল্যের ধারণা প্রবল হয়।"

(আল ইকতেসাদী মাসায়েলুল জেহাদ, পৃষ্ঠা : ৩১)

পুনরায় লেখেন, "এই যুগে শরীয়তী জেহাদের কোন নৈতিক সমর্থন নেই, কেননা, এই সময় না মুসলমানদের কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নেতা ও নেতৃত্বের বিধান আছে আর না তাদের কোন জোটবদ্ধপূর্ণতা ও আত্মসংযম অর্জিত হয়েছে, যে কারণে তারা তাদের বিরুদ্ধপক্ষের উপর জয়যুক্ত হওয়ার আশা করতে পারে।" (আল ইকতেসাদ, পৃষ্ঠা : ৪২)

এবং খোয়াজা হাসান নিযামী দেহলবী লেখেন, "জেহাদের রীতিনীতি আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরও জানা আছে। তারা জানে যখন কাফিররা ধর্মীয় ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং ন্যায় বিচারক নেতা যার কাছে যুদ্ধবিগ্রহের সমস্ত সাজসরঞ্জাম বর্তমান থাকে আর যুদ্ধের শরীয়তী নির্দেশনা প্রদান করে তাহলে যুদ্ধ সকল মুসলমানের উপর আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ইংরেজরা না আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে নাক গলায় (হস্তক্ষেপ করে) আর না কোন ব্যাপারে এমন জবরদস্তি করে যেটাকে অত্যাচার বলে অভিহিত করা যেতে পারে। আমাদের কাছে যুদ্ধের কোন সরঞ্জাম নেই তাই আমরা কোনভাবেই কারোও কথা মানব না। এবং না নিজেদের জীবন ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেব।"

(রেসালা শেখ সানোসি, পৃষ্ঠা :১৭, লেখক খোওয়াজা হাসান নিযামী)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের বরং তাঁর জন্মেরও আগে জেহাদের একটা পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল আর হযরত সৈয়্যদ আহমদ বেরেলবী ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ পাঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। কেননা, যেমনটা মৌলবী মাসউদ আহমদ নাদবী লেখেন, "ঐ সময় পাঞ্জাবে শিখ রাজত্বের প্রতিপত্তি ছিল। মুসলিম মহিলাদের সতীত্ব ও সামাজিক মর্যাদা নিরাপদ ছিল না। তাদের হত্যা বৈধতা প্রাপ্ত হয়েছিল। গরু জবাই নিষিদ্ধ ছিল। মসজিদগুলোকে আস্তাবল রূপে ব্যবহার করা হচ্ছিল। অত্যাচারের প্রবল প্লাবন ছিল যা পাঁচটি নদীর (তীরে গড়ে ওঠা) মুসলিম বসতি ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সব কিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল কিন্তু প্রতিরোধের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।"

(হিন্দুস্থান কি প্যাহলি তাহরীক পৃষ্ঠা : ৩৭)

মরহুম সৈয়্যদ সাহেবের শাহাদত তাঁর পরাজয়ের কারণ এটাই লিখছে, "নিজের দুঃখ দুর্দশা কোন ভাষায় বর্ণনা করা হবে মনের মধ্যে একটা ব্যাথা জাগ্রত হয় আর চোখে রক্ত ঝরতে থাকে যখন কোন মোল্লার ফতোয়া আর খানদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা মনে পড়ে.....মূর্খ মোল্লার দল জেহাদকারীদের ওয়াহাবী বলা শুরু করে, যার সংশোধন, মঙ্গল ও সাহায্যের জন্য এই সরঞ্জাম বিহীন ও লক্ষ্যবস্তুর নিকট তাঁর অনুগতরা হিজরতের কঠোর পরিশ্রম সহ্য করেছে, তারা নিজেরা জীবনের শত্রু হয়ে গেছে। খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে । পেশাওয়ার বিজয় সম্পন্ন হয়েছিল কিন্তু পেশাওয়ারের নেতৃবর্গের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে সৈয়্যদ সাহেবের মনোনীত কর্মসমূহ আর বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের গণহত্যা হয়েছে। আর চরম উদ্বেগ নিয়ে পেশাওয়ার সীমান্ত ছেড়ে পার্শ্ববর্তী রাজদুয়ারী উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেন এবং অবশেষে বালাকোটে শহীদ হন।"

(হিন্দুস্থান কি প্যাহলি তাহরীক পৃষ্ঠা ৪৭.)

মুসলমানদেরকে শিখদের অত্যাচারী রাজত্ব থেকে নিস্কৃতি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল, তা এভাবেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে যে, শিখদের পরিবর্তে ইংরেজরাই পাঞ্জাবের শাসক হয়ে গেল আর যেমন কিনা মওলানা জাফর থানসেরী লিখেছে, "সৈয়্যদ সাহেবের ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদের ইচ্ছা কখনোই ছিল না। তিনি এই বন্ধনমুক্ত সাম্রাজ্যকে নিজের রাজত্ব বলে মনে করত।..

(সয়ানেহ আহমদী কিলাঁ পৃষ্ঠা : ১৩৯)

এজন্য মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী লিখেছেন, "ভাই সকল! এখন আর তরবারীর সময় নেই। এখন তরবারীর পরিবর্তে কলমের সাহায্যে কাজ নেওয়া প্রয়োজন হবে। মুসলমানদের হাতে তরবারী আসা কেমন করে সম্ভব যখন তাদের হাতই উপস্থিত নেই। একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ঘোর শত্রু। শিয়ারা সুন্নীদের আর সুন্নী শিয়াদের, আহলে হাদীসরা আহলে তকলীদদের, এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ফিরকা অন্য ফিরকাকে এই দৃষ্টিতে দেখছিল।

(ইশাআতুসসুন্নাহ্, ৬ষ্ঠ খণ্ড নাম্বার ১২, পৃষ্ঠা: ৩৬৫)

সুতরাং জেহাদের রসদ (সরঞ্জাম) অনুপস্থিতির কারণে ইসলামী আইনের বৈধতা (শরীয়ত) অনুযায়ী তিনি (আঃ) শরীয়তের দৃষ্টিতে (শরীয়তী) যে জেহাদ সেই জেহাদকে অবৈধ স্থির করেছিলেন। তরবারীর যুদ্ধ অবৈধ করণের তৃতীয় কারণ হিসাবে তিনি এই

বলেছেন যে, আঁ হযরত (সাঃ) স্বয়ং প্রতিশ্রুত মসীহ্ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এমন সময়ে আবির্ভূত হবেন যখন কিনা ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে এবং ধর্মের জন্য (খাতিরে) যুদ্ধ-বিগ্রহ করার প্রয়োজন হবে না। অতএব হুজুর (আঃ) এই **'গভর্নমেন্ট আংরেজী আউর জেহাদ'** প্রবন্ধে বর্ণনা করেন, -"তেরো শত বছর হয়েছে তা মসীহ মাওউদের সম্মানে আঁ হযরত (সাঃ)-এর মুখ হতে **'ইয়াযাউল হারব'** বাক্য নিঃসৃত হয়েছে যার অর্থ এই যে, মসীহ মাওউদ যখন আবির্ভূত হবেন তখন যুদ্ধ-বিগ্রহ শেষ (রহিত) করে দেবেন। এবং এই দিকেই حتّٰی تضع الحرب اوزارھا কোরআনী আয়াতের ইঙ্গিত অর্থাৎ মসীহর আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত যুদ্ধ কর।" (ঐসময় পর্যন্ত যুদ্ধ কর যতক্ষণ পর্যন্ত মসীহর সময় আসবে) (গভর্নমেন্ট আংরেজী আউর জেহাদ, রুহানী খাযায়েন, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮)

আরও বলেন, "এযুগে যখন কিনা কোন ব্যক্তি মুসলমানদের ধর্মীয় কারণে হত্যা করে না তাহলে তারা কোন নির্দেশে নিরপরাধ লোকদেরকে হত্যা করে থাকে"। (গভর্নমেন্ট আংরেজী আউর জেহাদ, রুহানী খাযায়েন, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩)

সুতরাং তাঁর জেহাদ মুলতুবি (বিরতি) অর্থাৎ ধর্মীয় কারণে হত্যা অবৈধ করণের ফতোয়া (সিদ্ধান্ত) আঁ হযরত (সাঃ)-এর নির্দেশের বাস্তবায়নে, নিজের পক্ষ থেকে নয়। এবং আঁ হযরত (সাঃ)-এর নির্দেশের প্রকৃতার্থ এটাই ছিল যে, মসীহ মাওউদের যুগে সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় স্বাধীনতা পাওয়ার কারণে ধর্মের (আধ্যাত্মিক) কারণে হত্যার প্রয়োজন হবে না।"

এই প্রবন্ধ প্রকাশের কিছু দিন পর হযরত আকদাস (আঃ) ধর্মীয় জেহাদ বৈধ নয় এই বিষয় সম্পর্কিত নযমে (কবিতা) (এই খণ্ডের ৭৭-৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত) বর্ণনা করেছেন, যার গোড়ার দিকের স্তবকগুলির মধ্যে থেকে চারটি স্তবক

اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال
دیں کیلئے حرام ہے اب جنگ اور قتال
اب آ گیا مسیح جو دیں کا امام ہے
دیں کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے
کیوں بھولتے ہو تم یضع الحرب کی خبر
کیا یہ نہیں بخاری میں دیکھو تو کھول کر
فرما چکا ہے سیّد کونین مصطفیٰ
عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا

এই কবিতার মধ্যে হযরত আকদাস (আঃ) জিহাদ নিষেধের ফতোয়া দিতে গিয়ে বর্ণনা নিম্ন বর্ণিত তিনটি কারণ খুব বিস্তৃত আকারে সুন্দর রচনাশৈলীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। (তোহফা গুলড়বিয়া, রুহানী খাযায়েন, ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৭-৮০)

জেহাদের প্রকারভেদ

এ ব্যাপারে তিনি আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, জেহাদ শুধুমাত্র তলোয়ারের সাহায্যে যুদ্ধ করা নয় বরং জেহাদের অর্থে ব্যাপকতা পাওয়া যায় (জেহাদ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়)। কোরআন মজীদকে কাফিরদের (অস্বীকারকারীদের) নিকট পৌঁছান আর সত্যের প্রচার এবং ধর্মীয় উপদেশাবলী প্রদানও জেহাদ, বরং জেহাদে কবীর ।

অতএব আল্লাহতা'লা বলেন,

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا

(সূরা আল ফুরকান : ৫৩)

মওলানা আবুল কালাম আযাদ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখেন, "এখানে তলোয়ারের যুদ্ধ অর্থ হতে পারে না। জেহাদে কবীর যথার্থ সত্য আর সেই পথেই সমস্ত বাধা-বিপত্তি ও যন্ত্রণা দৃঢ়তার সহিত সহ্য করে নেওয়ার নামই জেহাদ।" (মসলায়ে খিলাফত ও জযিরাহ্ আরব, আরব পৃষ্ঠা : ১০৯)

এবং মৌলবী জাফর আলী খান এই আয়াত সম্পর্কে লেখেন "এই আয়াতে جَاهِدْهُمْ এর অর্থ এই যে, কাফিরদেরকে ধর্মোপদেশ মূলক ভাষণ প্রদান এবং তাদেরকে আহ্বান ও প্রচার করে বোঝানো। ইমাম ফকরুদ্দিন রাযি তাঁর ব্যাখ্যায় এইভাবে আলোকপাত করেছেন।" (যমিনদার ২৫ জুন ১৯৩১)

এবং মওলানা হায়দার যামান সিদ্দিকী লেখেন, "অনুরূপভাবে হাদীসে অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্যের বাণী উচ্চকিত করাকেও শ্রেষ্ঠ জেহাদ বলা হয়েছে। اِنَّ مِنْ اَعْظَمِ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ (রাওয়াহ আবু দাউদ ও তিরমিযী)..... সুতরাং পৃথিবীতে ধর্মীয় জ্ঞানের প্রচার-প্রসার ও ধর্মীয় শিক্ষা ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা এবং সেই সকল কাজ যা ধর্ম প্রতিষ্ঠার্থে করা হয় তা (ধর্ম প্রতিষ্ঠাকল্পে সম্পাদিত কর্ম সমূহ) জেহাদের অন্তর্ভুক্ত।" ('ইসলাম কা নযরিয়া জেহাদ' কিতাব মঞ্জিল লাহোর, পৃষ্ঠা : ১২৮-১৩০)

হাদীসে আরও এসেছে যে, যখন আঁ হযরত (সাঃ) তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন তখন তিনি বলেন

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ

' (বাইহাকী) অর্থাৎ তিনি তরবারীর যুদ্ধকে জেহাদে আসগার (ছেট যুদ্ধ)আর আত্মার পবিত্রকরণের (শুদ্ধিকরণের) জেহাদকে জেহাদে কবীর (বড় যুদ্ধ) আখ্যায়িত করেন। এটাই কারণ যে, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তরবারীর যুদ্ধের রসদ না পাওয়ার কারণে বলেছেন, "দেখ আমি একটা নির্দেশ নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি তা এই যে, এখন হতে তলোয়ারের যুদ্ধের অবসান হল কিন্তু নিজ আত্ম শুদ্ধির জেহাদ অবশিষ্ট আছে। এবং এই কথা আমি নিজের পক্ষ থেকে বলিনি বরং খোদার ইচ্ছা এটাই। সহীহ বুখারীর এই হাদীস চিন্তা কর। যেখানে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রসংশায় লিখেছেন যে, **'ইয়াযাউল হারব'** অর্থাৎ মসীহ্ যখন আবির্ভূত হবেন তখন ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন। (গভর্নমেন্ট আংরেজী আউর জেহাদ, রুহানী খাযায়েন ১৭তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৫)

নিষেধাজ্ঞার ফতোয়া অস্থায়ী

কোরআন ও হাদীসে পাওয়া যেত এমন ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি (আঃ) স্থায়ীরূপে তলোয়ারের যুদ্ধ নিষেধ করেন নি বরং তাঁর যুগে তলোয়ারের যুদ্ধের রসদ না পাওয়ার কারণে ঐ সময় পর্যন্ত নিষেধ বা স্থগিত করেছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত তার রসদ না পাওয়া যায় এবং জেহাদে আকবর ও জেহাদে কবীরের উপর বাস্তবায়ন করার জন্য বারংবার জোর দিয়েছেন। সুতরাং তিনি বলেন, "এই যুগে জেহাদ আধ্যাত্মিক রঙ ধারণ করেছে এবং এই যুগের জেহাদ এটাই যে, ইসলামের বাণী উচ্চকিত করুন। বিরুদ্ধবাদীদের অপবাদের উত্তর দিন। 'দ্বীনে মাতীন' ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর সৌন্দর্য পৃথিবীতে বিস্তার করুন। আঁ হযরত (সাঃ)-এর সত্যতা পৃথিবীতে প্রকাশ করুন, এগুলিই জেহাদ, **যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদাতা'লা কোন অন্য কোন রূপ দুনিয়াতে প্রকাশ না করেন।"** (মীর নাসির নবাব সাহেব বনাম হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর চিঠি, পৃষ্ঠা : ১১৩)

শব্দ **"যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদাতা'লা কোন অন্য কোন রূপ দুনিয়াতে প্রকাশ না করে।"** এবং "عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا" লাইন স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করছে যে, তাঁর ধর্মের খাতিরে তলোয়ারের যুদ্ধ মুলতুবি (রহিত) সম্বন্ধীয় ফতোয়া অস্থায়ী, আর ঐ পর্যন্ত সময়ের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না জেহাদের শর্ত সমূহ পাওয়া না যায় (পূরণ না হয়)। অনুরূপ ভাবে তিনি (আঃ) পাদরী ইমাদ উদ্দিনের জেহাদ সম্পর্কে ধর্মীয় নীতির উপর অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন , "এই ছিদ্রান্বেষী ইসলামী জেহাদের বর্ণনা করেছে আর সন্দেহ করে (মনে করে) যে, কোরআন উদ্দেশ্য বিহীন কোন শর্তকে জেহাদের ব্যাপারে তীব্র প্ররোচিত করে। অতএব এর চেয়ে বড় মিথ্যা ও কুৎসা আর নেই যদি কেউ চিন্তাশীল হয়। সুতরাং জানতে হবে যে, কোরআন শরীফ শুধুমাত্র লড়াইয়ের জন্য নির্দেশ (আদেশ) দেয় না বরং কেবলমাত্র সেই সকল লোকদের সাথে যুদ্ধের আদেশ প্রদান করে যারা খোদাতা'লার বান্দাদের বিশ্বাস আনয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এবং এই কথাতেও বাধা দেয় যে, সে আল্লাহ্তা'লার আদেশের আজ্ঞাকারী হয় ও তাঁর ইবাদত করে। এবং সেই সকল লোকদের সঙ্গে যুদ্ধের আদেশ দেয় যারা বিনা কারণে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Harhari (MSD)

জিহাদের ভ্রান্ত মতবাদের কুফল এবং প্রতিকারের উপায়

মূল (উর্দু) শরীফ কউসর, (শিক্ষক, জামিয়া আহমদীয়া) অনুবাদ:আবু সোহান মণ্ডল, শিক্ষক জামিয়া আহমদীয়া(কাদিয়ান)

সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ (সা.) একটি ধর্ম প্রবর্তন করেন যার নাম আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে ইসলাম রেখেছেন যেরূপ তিনি বলেন- إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ (আলে ইমরান: ১৯) এবং এর মধ্যে প্রবেশকারী ব্যক্তির নাম মুসলমান রাখা হয়েছে। যেমনটি আল্লাহ্ বলেন- هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ (আল হজ্জ-৭৯)

ইসলাম শব্দের অর্থ

ইসলাম আরবী শব্দ যেটি 'সালেমা' থেকে নির্গত। সালিমা শব্দের অর্থ হল শান্তি ও নিরাপত্তা। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন, **'আস সালামো মিনাল ইসলাম'** অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তা ইসলামের মধ্যে নিহিত। আল্লাহ্ তা'লা মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, وَاللّٰهُ يَدْعُوْا إِلٰى دَارِ السَّلَامِ (ইউনুস-২৬) অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে শান্তির দিকে আহ্বান করেন। ইসলাম শব্দের আর একটি অর্থ এই যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধান সমূহের পূর্ণ আনুগত্য করা।

ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা তার মান্যকারীদেরকে প্রত্যেক মানুষের সহিত ভালবাসা এবং নিষ্ঠার শিক্ষা দেয়। যদিও সেই ব্যক্তি পৃথক ধর্মাবলম্বী হোক না কেন। একজন মুসলমান নিত্য পাঁচবার নামায আদায় করে এবং প্রত্যেক নামাযের শেষে ডান ও বাম দুই দিকেই ফিরে আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমুতল্লাহি বাক্যটি উচ্চারণ করে যার অর্থ হল হে আমার ডান দিকের বসবাসকারীরা সে যে হোক না কেন,তোমার উপর আল্লাহ্র শান্তি বর্ষিত হোক এবং এভাবেই বামদিকে বসবাসকারী ব্যক্তির প্রতিও শান্তি বর্ষিত হোক। অতএব, ইসলাম এবং মুসলমান দুটি নামের দ্বারা এটিই প্রতীয়মান হয় যে, এই দ্বীন তার মান্যকারীদেরকে এটিই শিক্ষা দিয়ে থাকে যে, সে যেন পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের জন্য শান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক সমস্ত পৃথিবীর জন্য রহমত স্বরূপ

আল্লাহ্ তা'লা নবী করীম (সা.)কে সমস্ত পৃথিবীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। যেমন তিনি পবিত্র কুরআনে বলেন যে وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ - অর্থাৎ হে মহম্মদ! আমি তোমাকে সমস্ত পৃথিবীর জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।

(আম্বিয়া-১০৮)

এখানে কেবলমাত্র মুসলমান বা আরববাসীদের উল্লেখ নেই। বরং তিনি সমস্ত পৃথিবীর জন্য রহমতস্বরূপ। অতএব, প্রত্যেক মুসলমান যে নিজেকে নবী করীম (সা.)-কে মান্য করার দাবি করে তার কর্তব্য হবে যে, সে যেন খোদা সৃষ্ট জীবের প্রতি অত্যাচার না করে।

প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত ভালোবাসা কেন?

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে ভালোবাসা ও দয়া কেন করতে হবে? এর উত্তর নবী করীম (সা.) -এর হাদীস থেকে জানা যায়। তিনি (সা.) বলেছেন,

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهٖ

(মেশকাত, কিতাবুল আদাব)

অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্র সংসারস্বরূপ। সুতরাং মাখলুকের মধ্যে সবথেকে ভালবাসার পাত্র সে যে তাঁর বংশের সহিত ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করে।

কুরআন মজীদ থেকে এটি স্পষ্ট সাব্যস্ত হয় যে, দুনিয়ার প্রত্যেক ধর্ম ও বিশ্বাস এবং বিভিন্ন এলাকার লোক আল্লাহ্র বংশস্বরূপ। মানুষ যেমন নিজের বংশকে ভালোবাসে তেমনি সমস্ত পৃথিবীকে তার বংশের ন্যায় ভালবাসতে হবে। এবং এমন করার কারণেই আমরা খোদা তা'লার প্রিয়ভাজন হতে পারব। নচেত আমরা তার ভালবাসার পাত্র হতে পারবো না। কারণ যে আল্লাহ্র প্রতি প্রত্যেক মুসলমান ঈমান রাখে যে 'রব্বুল আলামীন' এবং শান্তিদাতা।

রহমতুল্লিল আলামীন যুদ্ধ কেন করেছেন?

এর উত্তর এই যে, যখন তাঁর (সা.) বয়স চল্লিস বছর হল তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হতে আরম্ভ করল যার ফলশ্রুতিতে তিনি মক্কাবাসীদেরকে বললেন যে, আল্লাহ তা'লা আমাকে রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। অতএব তোমরা এক আল্লাহ্র উপাসনা কর এবং পাপাচার থেকে বিরত হও।

আরবী ভাষায় একটি প্রবাদ বিখ্যাত যে, لِلْمَطَرِ مُحِبٌّ وَكَارِهٌ অর্থাৎ বৃষ্টিকে পছন্দকারীও আবার অপছন্দকারীও আছে। বাহ্যিক বৃষ্টির ন্যায় আধ্যাত্মিক বৃষ্টিকে কেউ পছন্দ করতে লাগল আবার কেউ অপছন্দ। পছন্দকারীরা ভালবাসা ও সরলতার রাস্তা বেছে নিল এবং অপছন্দকারীরা এবং বিরুদ্ধবাদীরা বিরোধীতার পথে ধাবিত হল। মক্কার বিরোধীরা এটি ভেবে নিয়েছিল যে আমরা শক্তির দ্বারা ইসলামের মান্যকারীদেরকে ধ্বংস করে দিব। অপরদিকে নবী করীম (সা.) বলেন যে, আমরা ভালোবাসার সহিত তোমাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাবো এবং কোনও প্রকারের বল প্রয়োগ করা হবে না। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেন لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ (বাকারা: ২৫৭)। অর্থাৎ ধর্মের ব্যাপারে কোনও বল প্রয়োগ নেই। এছাড়া আরও বলেন যে,

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۟ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ (الکہف:30)

(কাহাফ: ৩০) অর্থাৎ তুমি বলে দাও যে সত্য তোমাদের প্রভুপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসে গেছে। অতএব যে কে্উ একে গ্রহণ করতে পারে আবার কেউ চাইলে অস্বীকারও করতে পারে।

একদিন বা একমাস বা একবছর নয়, বরং ক্রমাগত তের বছর নবী করীম (সা.) এবং তাঁর মান্যকারীরা বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধীতার সম্মুখীন হন। অনেকেই তাদের মধ্যে শহীদও হয়েছেন, কিন্তু তিনি (সা.) পাল্টা বিরোধীতার পথ বেছে নেন নি। এবং এটি কোনও ভয়ের কারণে নয়, বরং মনুষ্যত্ব এবং ভালবাসার জন্য তিনি এমনটি করেন। এবং এটি বলেন যে, তারা না বোঝার কারণে আমাদের প্রতি অত্যাচার করছে। অথচ আব্দুর রহমান বিন অউফ যিনি মক্কার সর্দারদের মধ্যে ছিলেন, তিনি বলেন যে, হে রসুলুল্লাহ্! আমরা যখন মুসলমান ছিলাম না তখন মক্কার গণ্যমান্য ও ধনী ব্যক্তির মধ্যে আমার নামডাক ছিল, কিন্তু যখন ইসলাম গ্রহণ করলাম তখন আমাদের প্রতি বিরুদ্ধবাদীরা বিভিন্ন প্রকারের অত্যাচার আরম্ভ করে দেয়। আপনি আমাদেরকে আক্রমণ অনুমতি দান করুন। তখন তিনি (সা.) বলেন- اِنِّيْ اُمِرْتُ بِالْعَفْوِ এটি কখনই সম্ভব নয়। আমাকে ক্ষমা ও দয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। (নিসাই)এজন্যই আমি তোমাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিতে পারব না।

সারকথা এটিই যে, ক্রমাগত ১৩ বছর অত্যাচার সহ্য করার পর তিনি ভাবলেন যে, এরা না তো ইসলাম গ্রহণ করছে না আমাদেরকে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে দিচ্ছে। অতএব এখন দুটি পথ আমাদেরকে সামনে খোলা আছে। তাদের সাথে যুদ্ধ করা নচেৎ এখান থেকে হিজরত করে অন্যত্র চলে যাওয়া। অতএব তিনি অবশেষে মদীনায় হিজরত করেন।

অতএব এরপর এটি হওয়া উচিত ছিল যে, মুসলমানদের হিজরত করার কারণে তাদের পিছু না নেওয়া। কিন্তু কাফেররা মদীনায় গিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ

করার ষড়যন্ত্র করল। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন-

(মক্কায়) তারা নৃশংসভাবে অধিকাংশ মুসলমানদের হত্যা করে এবং তের বছর পর্যন্ত তারা এই কাজে লিপ্ত থাকে এবং নৃশংসভাবে তাদেরকে তরবারি দ্বারা হত্যা করা হয়। এতদ্সত্ত্বেও খোদা তা'লার পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে মোকাবেলা করার আদেশ দেওয়া হয়নি। এর ফলশ্রুতিতে তাদেরকে কুরবানীর পশুর ন্যায় হত্য করা হয়। এবং নবী করীম (সা.– কে পাথরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করা হয়। কিন্তু তিনি (সা.) এই সমস্ত কিছুকে পরিপূর্ণ ধৈর্যের দ্বারা বরদাস্ত করতে থাকেন। অতএব যখন অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তা'লা মোকাবেলা করার আদেশ দেন। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন-

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ
يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى
نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ
دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ (سورۃ الحج:40،41)

অর্থাৎ "যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হইতেছে তাহাদিগকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হইল, কারণ তাহাদের উপর যুলুম করা হইতেছে, এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। যাহাদিগকে তাহাদের ঘরবাড়ী হইতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হইয়াছে।

(সূরা হজ্জ-৪০-৪১, আয়াত: ৪০-৪১)

(গভর্ণমেন্ট ইংরেজি এবং জিহাদ)

সুধী পাঠকবৃন্দ! জেহাদ শব্দটি গভীর অর্থের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। জেহাদ কেবল কাফেরদের সহিত যুদ্ধ করাকে বোঝায় না বরং কোন কাজের প্রতি সম্পূর্ণ শক্তি খরচ করা এবং সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা করাকে জেহাদ বলা হয়। আরবী ভাষায় এটি জাহাদা এবং জুহাদ ও جاهدفی الامر হয় অর্থাৎ সে কাজ করার জন্য প্রচেষ্টা করল।

জেহাদ দ্বিনে ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যেটি প্রথম থেকে শুরু হয়েছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। কুরআন মজীদ এবং হাদীস থেকে জিহাদের বিভিন্ন অর্থ প্রমাণিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ জিহাদ কবীর, জেহাদে আকবর,জেহাদে আসগর ইত্যাদি।

জেহাদে আসগারের অপর নাম হল তরবারির যুদ্ধ অর্থাৎ যুদ্ধকে বলা হয়। এটি তখন কার্যকরী হয় যখন কোন অমুসলিম শক্তি বা দেশ দ্বীনে ইসলামকে অথবা মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য তরবারির দ্বারা যুদ্ধ করতে চায়। এবং তাদেরকে কেবলমাত্র 'রাব্বুনা আল্লাহ্ বলার কারণে দেশান্তরিত করা হয়।

তরবারির জেহাদ সম্পর্কিত মুসলমানদের মনগড়া বিশ্বাস।

দুঃখের বিষয় যে, মুসলমানেরা জেহাদের অপব্যাখ্যা করেছে। মুসলমানেরা ইসলামের নামে রক্ষপাত, কলহ-বিবাদ ইত্যাদিকে জিহাদ বলে চিহ্নিত করেছে। তারা লোভ লালসা এবং নিজেদের সুবিধার্থে অমুসলিমদের হত্যা করাকে জেহাদ বলে অভিহিত করেছে। এবং গাজি হওয়ার ইচ্ছায় বন্দুক দ্বারা অমুসলিমদেরকে হত্যা করার নাম জিহাদ রাখা হয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

স্মরণ রাখবেন জেহাদের বিষয়টিকে বর্তমান সমাজের আলেমরা যেভাবে বর্ণনা করেছে সেটি সঠিক নয় এবং এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, তারা তাদের বক্তৃতা দ্বারা মানুষকে পশুর ন্যায় বানিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এমনটিই হল।

এবং আমি নিশ্চিত যে, যে রকম রক্তপাত এই সমস্ত মানুষের দ্বারা হয়েছে তার সমস্ত দায় ঐ সমস্ত মৌলবীদের উপর বর্তায় যারা এই অপব্যাখ্যা তাদেরকে শিখিয়েছে। যার ফল হল ভয়ানক রক্তপাত। (ইংরেজি গভর্নমেন্ট এবং জিহাদ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ৭)

মোট কথা, এই জিহাদে বিশ্বাস যা তারা পোষণ করে আছে একদম সঠিক নয়। এবং এর ফল হল নিরীহ মানুষকে হত্যা করা।

(ইংরেজি গভর্নমেন্ট এবং জিহাদ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ৮)

জিহাদের অপব্যাখ্যার কুফল

১) খৃষ্টানরা তাদের নিজ ধর্মকে 'ভালবাসার ধর্ম' বলে পরিচিত করছে এবং পৃথিবীবাসী খৃষ্টধর্মকে ভালবাসার ধর্ম বলে বিশ্বাস করতে লাগল। একইভাবে হিন্দুরা তাদের ধর্মকে অহিংসা রূপে উপস্থাপন করতে লাগল। এবং এই ঘোষণা দিল যে, হিন্দু ধর্মে কোনও প্রাকারের অসহিষ্ণুতা নেই। এই ধর্মে মানুষ হত্যা তো দূরের কথা কোন প্রকারের জীবকেও হত্যা করা যাবে না। এছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের ধর্মকে অসহিংসা এবং সত্য প্রমাণের চেষ্টা শুরু করে দেয়।

এর বিপরীতে নামধারী মুসলমান মৌলবীরা যেভাবে ইসলামকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরল তাতে সবাই বিশ্বাস করতে লাগল যে, ইসলাম হত্যা ছাড়া আর কোন শিক্ষা দেয় না।

২) দুঃখের বিষয় যে, এ যুগে প্রত্যেক মুসলিম দেশে দুই ধরণের দল আছে। একটি সরকারের পক্ষে এবং অপরটি বিপক্ষে। এবং প্রত্যেকেই আন্তার্জাতিক ভাবে ইসলামের শত্রুকে সাহায্য করছে। এবং ভয়ানক অস্ত্র ও তরবারী এরাই বন্টন করছে। অথচ ইসলামের সাথে এর দূরতম সম্পর্ক নেই বরং বহির্গত শক্তির এটি একটি ষড়যন্ত্র মাত্র এবং ইসলামকে কলুষিত করার চক্রান্ত।

উদাহরণস্বরূপ আফগানিস্তানে রাশিয়ার সেনা প্রবেশ করে পুরো দেশটাকে দখল করে নেয়। রাশিয়ার শত্রু আমেরিকা এটি ভালো চোখে দেখতে পারল না এবং তারা পেশাওয়ারের আশেপাশের মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে আরম্ভ করে দিল এবং তাদেরকে জেহাদ করার জন্য আফগানিস্তানে পাঠিয়ে দিল। অবশেষে রাশিয়া সেখান থেকে অন্যত্র যেতে বাধ্য হল এবং আমেরিকা সম্পূর্ণভাবে সে স্থানকে দখল করে নিল এবং আফগানিস্তানে এখনও যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগেছে। এবং এ সব কিছুই ইসলামকে বদনাম করার জন্য করা হচ্ছে।

কেবলমাত্র আফগানিস্তান নয়। ইরাক, মিশর,লিবিয়া, ফিলিস্তিন ইত্যাদি দেশেও ইসলামকে বদনাম করা হচ্ছে। এবং অপরদিকে নিজেদের দেশকেও ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

জেহাদের মনগড়া বিশ্বাস এবং তার কুফল থেকে বাঁচার উপায়

আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে ন্যায়বিচারক এবং মীমাংসাকারী রূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি (আ.) এই সমস্ত বিশ্বাসের সংশোধন করেন যা মুসলমারা বিকৃত করে দিয়েছিল তার মধ্যে জিহাদ অন্যতম।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জিহাদের সঠিক বিশ্লেষণ করেন এবং বলেন যে, এযুগে কোন দেশ বা শক্তি মুসলমানদেরকে তাদের ধর্মীয় আচারাদি মান্য করার জন্য তরবারি দ্বারা বাধা দেয় না। না তাদেরকে ইসলামকে মান্য করার জন্য ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। না তাদের উপর সেইভাবে অত্যাচার করে যেভাবে মক্কার কাফেররা মুসলমানদে উপর অত্যাচার করেছিল। অতএব এ যুগে তরবারির জিহাদের কোনও অবকাশ নেই।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আজ থেকে তরবারির জিহাদ বন্ধ হল। অতএব যে কেউ এখন তরবারির দ্বারা কাফেরদের উপর আক্রমণ করবে এবং নিজেকে গাযি বলে পরিচয় দিবে, সে সম্পূর্ণভাবে নবী করীম (সা.) কে অমান্য করল। কেননা আজ থেকে ১৩০০ বছর পূর্বে তিনি (সা.) বলে গিয়েছিলেন যে, আগমণকারী ঈসা তরবারির যুদ্ধকে রহিত করবে। অতএব আমার আবির্ভাবের সাথে সাথেই তরবারি যুদ্ধের অবসান হল। আমার পক্ষ থেকে শান্তির বাণী প্রেরণ করা হল। খোদা তা'লার দিকে আহ্বান জানানোর কেবল একটি পন্থা নেই। অতএব যে পন্থার উপর নির্বোধরা আপত্তি করেছে, খোদা তা'লা চান না যে তা পুনরায় অবলম্বন করা হোক। যেরূপ যে সব নিদর্শনাবলী ইতিপূর্বে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, সেগুলি আমাদের নবী করীম (সা.) কে দেওয়া হয় নি। কাজেই মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর সেনাদলকে সেই নিষিদ্ধ স্থান থেকে

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের পুণ্যের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইসলাম আহমদীয়াতের জন্য মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করুন। (হুযুরের বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam, Jalpaiguri

পিছু হটার নির্দেশ দিচ্ছেন।

(খুতবা ইলহামিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৬, পৃ: ২৮)

এছাড়া বলেন যে, অতএব তরবারির যুদ্ধকে রহিত করা হল। কারণ এখন তার কোনও কারণ অবশিষ্ট থাকল না। আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যেমনভাবে কাফেরার আমাদেরকে আক্রমণ করবে আমরা তেমনভাবেই তাদেরকে আক্রমণ করব। আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত না তাদের উপর তরবারি দ্বারা আক্রমণ করব যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আমাদেরকে তরবারি দ্বারা হত্যা করছে।

তোহফা গোলডবিয়া পুস্তকে তিনি বলেন-

وجوہ الجہاد معدومۃ فی ھذا الزمن وھذہ البلاد ۔فالیوم حرامٌ علی المسلمین ان یحاربو اللدین ۔و ان یقتلوا من کفر بالشرع المتین ۔فان اللہ صرّح حرمۃ الجہاد عند زمان الامن والعافیۃ ''

অর্থাৎ যেহেতু বর্তমান যুগে এদেশে জিহাদের কারণগুলি বিলুপ্ত হয়েছে। তাই মুসলমানদের জন্য এখন অবৈধ হবে ধর্মের কারণে যুদ্ধ করা এবং এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা যে কুরআনী শরিয়তকে অস্বীকার করে। কেননা খোদা তা'লা স্পষ্টরূপে বলে রেখেছেন, শান্তি ও ক্ষমার যুগে জিহাদ অবৈধ। .

(তোহফায়ে গোল্ডবিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ৮২)

হকীকাতুল মাহদী পুস্তকে তিনি বলেন,

''فرفعت ھذہ السنۃ برفع اسبابھا فی ھذہ الایام ۔و اُمرنا ان نعد للکافرین کما یعدون لنا ولا نرفع الحسام قبل ان نقتل بالحسام ''(حقیقۃ المہدی، روحانی

অতএব এই রীতি (অর্থাৎ তরবারির জিহাদ) স্থগিত রাখা হয়েছে। কারণ এখন এর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে কাফেরদের মোকাবিলা করার জন্য অনুরূপ প্রস্তুতি নেওয়ার যেরূপ প্রস্তুতি তারা নিয়ে থাকে। আমরা তাদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ তরবারি ধারণ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমাদেরকে হত্যা করতে আমাদের উপর আক্রমণে উদ্যত হয়।

(হাকীকাতুল মাহদী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪,পৃ: ৪৫৪)

সুতরাং তিনি (আ.) মুসলমানদেরকে জিহাদ করার জন্য নিষেধ করেন নি, বরং বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে ইসলামের নামে তরবারি দ্বারা জিহাদ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ তারা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য তরবারি তুলে নেয় নি। অতএব, মুসলমানের জন্য এটি বৈধ নয় যে, তরবারি মাধ্যমে অমুসলিমদেরকে হত্যা করুক। এবং গাজী হওয়ার জন্য তাদের শিরোচ্ছেদ করুক।

মুসলমানদের জিহাদ করা জন্য না তরবারি আছে আর না বর্ম

হযরত মহম্মদ (সা.) বলেন যে, إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ (صحیح مسلم، کتاب الامارۃ)

(সহী মুসলিম, কিতাবুল আমারাহ) অর্থাৎ নির্বাচিত ইমাম ঢাল বা বর্ম স্বরূপ কেননা, তার পিছনে থেকে যুদ্ধ করা যায়। এমন যুদ্ধকারীর জন্য আল্লাহ্ তা'লা অঙ্গীকার করেছেন যে, আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করবেন। এযুগে মুসলমান দেশগুলি যারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করে থাকে প্রত্যেক পদক্ষেপে তারা অসফলতার শিকার। অতএব এটি সুস্পষ্ট যে, উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করছেন না। হ্যাঁ, যে সমস্ত রাজনৈতিক যুদ্ধগুলি হচ্ছে সেগুলি রাজনীতি অনুযায়ী হচ্ছে। এমন রাজনীতির যা কেবল স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য হয় ইসলামের সহিত এর দূরতম কোনও সম্পর্ক নেই।

প্রত্যেক যুগের জিহাদ বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

واعلمو ان وقت الجہاد السیفی قد مضی ولم یبق الا جہاد القلم والدعاء وآیات عظمیٰ

অর্থাৎ এখন তরবারির যুদ্ধের সময় নেই, বরং দোয়া এবং মহান আয়াত দ্বারা জিহাদের সময়।

(হাকীকাতুল মাহদী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪, পৃ: ৪৫৭)

তিনি আরও বলেন,

فلا سیف فی ھذا الزمان الّا سیف قوۃ البیان ولا اجد فی ھذا العصر تاثیر القنات الّا فی البراھین و الادلۃ والآیات

অর্থাৎ এ যুগে বাকশক্তি ব্যতিরেকে কোনও তরবারি নাই। এবং দলিল প্রমাণের মধ্যে যে শক্তি আছে সেটি তরবারির মধ্যে কখনোই নেই।

(হাকীকাতুল মাহদী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪, পৃ: ৪৬৪)

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে নবী করীম (সা) দ্বারা যে জিহাদের আদেশ দিয়েছেন সেটি হল জেহাদে আকবর'। অর্থাৎ বড় জেহাদ। যেমনটি আল্লাহ্ বলেন, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (ফুরকান, আয়াত-৫৩) অর্থাৎ তুমি কাফেরদের কথা মান্য করো না এবং এই (কুরআন) দ্বারা জেহাদে আকবর কর। অন্যত্র বলেন يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ (মায়েদা, আয়াত-৬৮) অর্থাৎ হে রসূল! তোমার প্রভুপ্রতিপালক দ্বারা যে বাণী তোমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে সেটিকে মানুষের মধ্যে পৌঁছে দাও।

বর্তমান যুগে যে জেহাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেটি হল তবলীরে জিহাদ। এবং এই জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রত্যেক যুগে আবশ্যক করা হয়েছে। কিন্তু বড়ই অনুতাপ! মুসলমান মোল্লারা এই জিহাদের দিকে মানুষকে আহ্বান না করে এমন জিহাদের প্রতি আহ্বান করল যার প্রয়োজন এযুগে নেই। এজন্য প্রত্যেক পদক্ষেপে মুসলমানরা অপদস্ত হয়েছে। আজ থেকে প্রায় ১০২ বছর আগে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলে গিয়েছেন-

হে বন্ধুগণ! জিহাদের চিন্তা ছেড়ে দাও, কেননা, ধর্মের জন্য যুদ্ধ এখন হারাম। এই আদেশ শুনে যারা যুদ্ধের দিকে ধাবিত হবে, তারা কাফেরদের পক্ষ থেকে ভীষণভাবে লাঞ্ছনার শিকার হবে।

(রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ৭৭)

বিগত কয়েক বছর তার সাক্ষী বহন করছে যে, যখনই মুসলমানরা তরবারি যুদ্ধ করার জন্য ময়দানে নেমেছে তারা লাঞ্ছনা ও অপমনের শিকার হয়েছে।

এযুগে তবলীগে ইসলাম এবং জিহাদ বিল কুরআন অর্থাৎ কুরআনের জিহাদের প্রয়োজন। আলহামদোলিল্লাহ্ জামাত আহমদীয়া তার পঞ্চম খলীফার অধীনে এই কাজটি নিরলসভাবে করে যাচ্ছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

মোট কথা এখন প্রতিশ্রুত মসীহ এসে গেছে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জিহাদ থেকে বিরত হওয়া আবশ্যক। আমার আগমন না ঘটলে হয়ত এ ধরনের জিহাদ সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকত। কিন্তু আমার আগমনের ফলে তোমরা প্রতিশ্রুত দিনের সাক্ষী হয়েছ। এজন্য ধর্মের নামে রক্তপাতের বিষয়ে খোদার সামনে তোমাদের কোন যুক্তি ধোপে টিকবে না। যে ব্যক্তির অন্তর্দৃষ্টি আছে এবং যে কুরআন ও হাদিস নিয়ে চিন্তা করে, সে দেখতে পাবে– এ ধরনের নির্মম জিহাদের কোন কার্য কারিতা এখন আর নেই। বরং তা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত বেহেশতের প্রত্যাশী নফসে আম্মারা (অবাধ্য আত্মা)-র অবৈধ এক কর্ম। আমি এইমাত্র বলেছি, আমাদের নবী (সা.) নিজে কখনো প্রথম তরবারি ধারণ করেননি। বরং এক সুদীর্ঘ সময় কাফেরদের হাতে অত্যাচারিত হয়ে ধৈর্যের এমন পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন, যা সাধারণ কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আর একইভাবে তাঁর (সা.) সাহাবায়ে কেরামও এই উচ্চাঙ্গীন উদাহরণ স্থাপন করেছেন। তাঁরা (রা.) নির্দেশিত পথেই নিষ্ঠা ও ধৈর্য প্রদর্শন করেছিলেন। পদপিষ্ট হয়েও তাঁরা টু শব্দটি করেননি। তাঁদের চোখের সামনে তাদের সন্তানদের টুকরো-টুকরো করা হয়েছে। তাঁদেরকে বয়কট করা হয়েছে। কিন্তু তাঁরা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত কোন প্রতিবাদ করেনি। কেউ কি পৃথিবীতে এমন উদাহরণ দেখাতে পারবে যে, কোন নবীর কোন একজন অনুসারীও প্রতিবাদের হকদার হওয়া সত্বেও শুধুমাত্র খোদার আদেশে নিজেকে বিরত রেখেছে? (গভর্নমেন্ট আংরেজি অউর জিহাদ

যুগ ইমামের বাণী

পরনিন্দা ও পরচর্চা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা উচিত।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৪০৭)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, kolkata

কুরআনের আলোকে জিহাদের তাৎপর্য

মূল: নাসির আহমদ আরিফ, ইসলাহ ও ইরশাদ অনুবাদ:আজিবুর রহমান, মুবাল্লিগ সিললিা

ইসলাম হল এক পরিপূর্ণ ধর্ম। এবং পবিত্র কুরআন হল এক পরিপূর্ণ জীবন বিধান, যা মানব জীবনকে পরিপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকে। এবং তাকে জীবন অতিবাহিত করার জন্য সমস্ত পদ্ধতি শিখায়। এবং এটিও শেখায় যে মানব জীবনের আসল উদ্দেশ্য কি। সে আধ্যাত্মিক কর্ম হোক বা বাহ্যিক কর্ম হোক। পবিত্র কুরআনে জিহাদের প্রকার এবং যা তার ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, আমি সংক্ষেপে তা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

স্পষ্ট থাকে যে জিহাদ শব্দটি জাহাদা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। যা আরবি ভাষার একটি মূল ধাতু, এবং এর অর্থ হল কষ্ট সহ্য করা। এবং জিহাদের অর্থ হল কোন কাজে এরূপ পরিপূর্ণ চেষ্টা করা যার মাঝে কোনও ত্রুটি থাকে না।

(তাজুল উরুস)

সাধারণত জিহাদ শব্দের অর্থ হত্যা এবং লড়াই ঝগড়ার বলে করা হয়। কিন্তু এই অর্থ সম্পূর্ণ ভুল, বিধান অনুযায়ী এর অর্থ হল, পরিশ্রম এবং পরিপূর্ণ চেষ্টা করা।

যখন আমরা পবিত্র কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন করি, সেখানে আমরা নিম্নলিখিত চার প্রকারের জিহাদের উল্লেখ পাই। আমি সংক্ষেপে পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে তা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব।

১) জিহাদ বিন নাফস অর্থাৎ আত্মাকে আঘাতকারী, ধ্বংসকারী প্রতিটি বিষয়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। এবং নিজের আত্মাকে প্রত্যেক কুকর্ম থেকে রক্ষা করা। ২) জিহাদ বিল কুরআন, অথাৎ পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে ইসলামের তবলীগ করা, প্রচার করা এবং পবিত্র কুরআনের প্রকৃত ও সুন্দর এবং শান্তিপ্রিয় শিক্ষাকে বিস্তৃতি দান করা। ৩) জিহাদ বিল মাল, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করা। এবং ধর্মীয় প্রয়েজনে বেশি বেশি করে আর্থিক কুরবানী করা ৪) জিহাদ বিস সাইফ, অর্থাৎ সাইফ, অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্য জিহাদ করা।

জিহাদ বিন নফস

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন-

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(আনকাবুত, আয়াত: ৭০) অর্থাৎ যারা আমার নৈকট্য অর্জন করার জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করে, আমরা তাদেরকে অবশ্যই আমার দিকে অগ্রসর হওয়ার দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকি। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ পুণ্যবানদের সঙ্গী।

এর অর্থ হল, যারা আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসায় বিলীন হয়ে যায় এবং খোদা তা'লাকে অর্জন করার পূর্ণ চেষ্টা করে, খোদা তা'লা তাদেরকে সফলতা প্রদান করেন এবং নিজের নৈকট্য প্রদান করেন, এবং তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিফলে যায় না, বরং এর ফলে তারা জাগতিক বিষয়াদিতেও সফলতা অর্জন করে থাকে। এবং খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জনের পথ তাদের জন্য সুগম হয়ে যায়। যার ফলে তারা উন্নতির শিখরে পৌঁছে যায়। নবী করীম (সা.) এক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পথে বলেন, আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে যাচ্ছি। (এবং বড় জিহাদ হল) মানুষ নিজের আশা-আকাঙ্খার বিরুদ্ধে (চাওয়া-পাওয়ার বিরুদ্ধে) জিহাদ করা।

(কানুযুল উম্মাল, কিতাবুল জিহাদ ফিল জিহাদিল আকবর মিনাল আমাল)

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে জিহাদ বিন নফস হল সব চেয়ে বড় জিহাদ। অতএব যারা খোদা তা'লার ভালবাসা এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে তাদের জন্য পুণ্যের পথ সুগম হয়ে যায়। কিন্তু এর জন্য শর্ত হল যে, সে যেন খোদা তা'লা পক্ষ থেকে বর্ণিত মানের উপর পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এবং কোনও বালা-মুসিবতকে ভয় না করে, এবং কোন পরীক্ষার মধ্যে যেন সে অসন্তুষ্টি বোধ না করে, বরং অগ্রসর হতে থাকে। আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত এই জিহাদে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করছে। এবং প্রত্যেক ময়দানে সে পুণ্যের ময়দান হোক বা পরীক্ষার ময়দান হোক না কেন, পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত এগিয়ে যাচ্ছে। এবং খোদা তা'লার নৈকট্য এবং ভালবাসার দৃশ্য দেখে চলে যাচ্ছে। তাদের জন্য শত্রুপক্ষরা যদি একটি দ্বার বন্ধ করে দেয় খোদা তা'লা তাদের জন্য শত শত দ্বার খুলে দেন। এবং তারা নিজেদের পুণ্যের কারণে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসার পথে দিনের পর দিন এগিয়ে চলে যাচ্ছে এবং প্রত্যেক ময়দানে অন্যান্য মুসলমানদের চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে। যা অ-আহমদী ভাইয়েরাও স্বীকার করছে।

১) মুকাররম শেখ আকরম সাহেব এম.এ লেখেন যে, এইসব মুসলমানদের তুলনায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতে অসাধারণ প্রস্তুতি, উদ্যম, আত্মবিশ্বাস এবং ধারাবাহিকতা বিদ্যমান রয়েছে। তারা মনে করে যে সমস্ত বিশ্বের আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসা তাদের নিকট রয়েছে।

(মৌজে কওসার, পৃ: ১৯২)

২) মুকাররম মকবুল রহিম মুফতি সাহেব লেখেন যে, জামাত আহমদীয়ার মধ্যে যোগ্য এবং পরিশ্রমী লোক বিদ্যমান হওয়ার একটি কারণ বরং বিশেষ কারণ এই যে, তারা বিগত ১০০ বছরের মধ্যে প্রতিটি স্তরে সমস্ত ধরণের ঝগড়া-বিবাদ এবং মতভেদ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে নিজের জামাত এবং জামাতের সদস্যদের সংশোধন এবং উন্নতির জন্য বিশেষ পরিকল্পনার সাথে চেষ্টা করছে।

(রোযনামা মাশরিক, ২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪)

জিহাদ বিল কুরআন

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন:

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا

(সূরা আল ফুরকান, আয়াত: ৫৩)

অর্থাৎ তুমি কাফেরদের আনুগত্য করো না এবং এই কুরআনের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে জিহাদ কর।

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে আল্লাহ্ তা'লা মুমিনদেরকে বলেছেন যে তোমরা কাফেরদের আনুগত্য করো না, বরং পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে জিহাদ কর এবং এই জিহাদ হলো ইসলাম প্রচারের জিহাদ। যা (ইসলামের পরিভাষায়) দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় জিহাদ এবং এই জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য অনিবার্য। কিন্তু বর্তমান মুসলমানগণ এই জিহাদ হতে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। জামাত আহমদীয়ার ওপর খোদা তা'লার এটি অনেক বড় কৃপা যে, তিনি এই কাজটি অর্থাৎ জিহাদে কবীর আহমদীয়া মুসলিম জামাতের হাতে সোপর্দ করেছেন। এবং জামাত আহমদীয়া আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই জিহাদে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। আর এই আদেশ পালনার্থে তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে লোকদেরকে সঠিক ইসলামি শিক্ষায় আলোকিত করছে,পবিত্র কুরআনের বরকত এবং মাহাত্ম্য বর্ণনা করছে, এর প্রকৃত সৌন্দর্য এবং শান্তিপ্রিয় শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত করছে। এবং পবিত্র কুরআনের মহান বরকতের কথা উল্লেখ করে তাদেরকে ইসলামের সঙ্গে যুক্ত করছে। আর এই কথা অ-আহমদীরাও স্বীকার করছে।

১) মৌলানা জাফর আলী খান সাহেব এডিটর জমিনদার পত্রিকা লাহোর লেখেন, বাড়িতে বসে বসে আহমদীদেরকে গালমন্দ করা খুব সহজ ব্যাপার কিন্তু এটি কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে,এটিই একমাত্র জামাত যে জামাত প্রচারকদেরকে ইংল্যান্ড এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশে পাঠিয়ে রেখেছে।

(আখবার জমিনদার লাহোর, ডিসেম্বর, ১৯২৬)

২) জনাব আব্দুল হক সাহেব 'উলামায়ে ইসলাম সে গুজারিশ' নামক প্রবন্ধে লেখেন, কাদিয়ানী টেলিভিশন পাকিস্তানের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে গেছে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত এবং ব্যাখ্যা, হাদীসের দরস, হামদ ও নাত, এবং সমস্ত জাতির কাদিয়ানীদের বিশেষ করে আরববাসীদেরকে বারবার উপস্থাপন করে কাদিয়ানীরা আমাদের যুবক প্রজন্মের মন ও মস্তিষ্কে পরিপূর্ণভাবে বিস্তৃতি লাভ করে নিচ্ছে। (হফতা রোযা আল এতসাম, ২৪ জানুয়ারী, ১৯৯৭)

৩) মৌলানা মনজুর আহমদ চেনিউটি সাহেব এক সাক্ষাতকারে বলেন, রুশ ভাষায় কাদিয়ানী জামাত পবিত্র কুরআনের অনুবাদ করে গোটা রুশ দেশে বিতরণ করে দিয়েছে। কাদিয়ানীরা কমপক্ষে ১০০টি ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করেছে যা গোটা বিশ্বে বিতরণ করা হয়ে থাকে।

(হফতা রোযা ওজুদ করাচি, ২০০০, পৃ: ৩১)

৪) কাযি মোহাম্মদ আসলম সাইফ সাহেব ফিরোজপুরী (ধার্মিক জামাতগুলির জন্য চিন্তার বিষয়) নাম প্রবন্ধে লেখেন যে, কাদিয়ানীদের কোটি কোটি টাকার বাজেট রয়েছে। তবলীগের নামে তারা গোটা বিশ্বে ফাঁদ পেতে রেখেছে। তাদের প্রচারকগণ দেশ-বিদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে প্রচার করছে। তারা স্ত্রী-সন্তান , ঘরবাড়ি ও পানাহার ছেড়ে আফ্রিকার উত্তপ্ত মরুভূমিতে, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং আমেরিকায় কাদিয়ানীয়াতের প্রচারের জন্য ঘর ঘর সফর করছে। (হাফতা রোজ আহলে হাদীস লাহোর, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২, পৃ:১১ ও ১২)

অতএব এটি সেই মহান জিহাদে কবীর, যা বর্তমান যুগে জামাত আহমদীয়া পূর্ণ করে দেখাচ্ছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শত্রুরা একথা অতি উদ্বেগপূর্ণ শব্দের সাথে স্মরণ করে, কিন্তু আজ তাদের সাধ্য নেই যে তারা একে বাস্তবায়ন করে দেখাবে। এবং অযথা আহমদীদের উপর অপবাদ আরোপ করে যে এরা জিহাদে বিশ্বাসী নয়। আজ আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে জিহাদকারী আহমদীদেরকে প্রতিটি ময়দানে সফলতা এবং সাহায্য প্রদান করছেন। এবং ঘোর বিরোধীতা সত্ত্বে তারা বিশ্বের দূর-দূরান্তের দেশগুলিতে গিয়ে জিহাদ করছে। এবং যারা আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (সা.) কে গালি দিত এই তবলিগের মাধ্যমে আজ তারাই হযরত মুহাম্মদ মোস্তাফা (সা.)-এর উপর দরূদ প্রেরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

জিহাদ বিল মাল

ধর্মপ্রচারার্থে আল্লাহ্ তা'লার পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করাকেও জিহাদ বলা হয়, আল্লাহ্ তা'লা পবত্রি কুরআনে বলেন,

وَجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَ
اَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

(সূরা তওবা, আয়াত: ৪১)।

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর্ পথে নিজেদের ধন-সম্পদ এবং নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে জিহাদ করো। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ জামাত আহমদীয়া এই জিহাদেও এক অতুলনীয় এবং উচ্চ মর্যাদা রাখে। এবং প্রত্যেকটি দিন যা জামাত আহমদীয়ার জন্য উদিত হয় এই জিহাদের বরকতের ফলে নতুন নতুন উন্নতির দ্বার জামাতের জন্য উন্মোচিত হচ্ছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে জামাতের সদস্যদের উপর পরীক্ষা এবং ঝড়-তুফানের যুগ অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু তারা আর্থিক ও জীবন উৎসর্গীকরণের মাধ্যমে এরূপ আদর্শ উপস্থাপন করছে যার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া শুধু কঠিনই নয়, বরং অসম্ভব। এবং অ-আহমদীরা জামাতের আর্থিক কুরবানীকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। এই ব্যাপারে অ-আহমদীদের কিছু মন্তব্য উপস্থাপন করছি।

১) মুকাররম হাফিজ আব্দুল ওহীদ সাহেব নিজের এক প্রবন্ধে লেখেন যে, একটি বিশ্লেষণ অনুসারে বিশ্বের প্রতিটি কাদিয়ানী নিজের মাসিক আয়ের দশ শতাংশ স্বেচ্ছায় নিজেদের ধর্ম প্রচারার্থে ব্যয় করে। কোন হঠাৎ প্রয়োজনীয়তায় ব্যয় করা এটি তার বাইরে। এই ফান্ডের সুবাদে একটি স্থায়ী টিভি এবং রেডিও স্টেশন স্থাপন করে নিয়েছে, যার মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা কাদিয়ানীদের তবলীগি মিশন অব্যাহত থাকে।

(গাযারিয়া আল এতেসাম,১১ ফেব্রুয়ারী, ২০০০)

২) আব্দুর রহিম আশরাফ সাহেব লেখেন, এদের অর্থাৎ জামাত আহমদীয়ার কিছু অন্যান্য দেশের জামাতগুলো এবং সদস্যরা কোটি কোটি টাকার সম্পদ সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া রাবওয়া এবং সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ানের নামে উৎসর্গ করে রেখেছে।

(হাফতা রোযা আল মুনির, ২রা মার্চ, ১৯৫৬)

৩) মুকাররম মৌলভি মঞ্জুর আহমদ সাহেব চিনোওটি এক সাক্ষাতকারে বলেন, প্রত্যেক কাদিয়ানী নিজের মাসিক আয়ের দশ শতাংশ স্বেচ্ছায় নিজেদের ধর্ম প্রচারার্থে কাদিয়ানী জামাতের জন্য ব্যয় করে। হাজার হাজার লোক নিজের সম্পত্তির দশভাগের একভাব ওসীয়্যত করেছে। প্রতি ঘণ্টায় পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করে কাদিয়ানী জামাত একটি টিভি চ্যানেল নিয়েছে যা ২৪ ঘন্টা অব্যাহত থাকে। আমাদের কাছে কিন্তু এই সবের সাধ্য নেই।

(হপ্তা রোজা ওজুদ করাচি, ২৪ নভেম্বর, ২০০০)

অতএব আজ আল্লাহ্ তা'লা জামাত আহমদীয়াকে এরূপ নিষ্ঠাবান ও পুণ্যবানদের এক জামাত প্রদান করেছেন যারা কুরবানীর এক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে দেখিয়েছে। প্রত্যেকদিন নিত্যনতুন শান ও শওকতের সাথে আর্থিক কুরবানী কারীরা ইতিহাস রচনা করছে এবং এই পুণ্যবানরা একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে একে আল্লাহ্ কৃপা বলে মনে করে আর্থিক কুরবানী করে এবং কেহই একে জামাতের উপর কৃপা করেছে বলে আর্থিক কুরবানী করে না। বরং শুধুমাত্র তাদের উদ্দেশ্য এটিই হয়ে থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লার পয়গাম যেন বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছে যয়। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, আহমদীয়াতের শত্রুরা জামাত আহমদীয়াকে নিশ্চিহ্ন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে, তাদের ধন-সম্পদ বিনষ্ট করেছে, তাদের টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক পরীক্ষায় জামাত আহমদীয়া দৃঢ় ছিল। এবং নিজেদের আর্থিক কুরবানীর মানকে নেমে যেতে দেয় নি, এই সব আর্থিক কুরবানীর ফলেই ইসলামের শিক্ষা বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে। এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত বিশ্বের ২১২ টি দেশে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -র পতাকা উত্তোলন করেছে, এই ধারা অব্যাহত ছিল এবং থাকবে।

জিহাদ বিস সাইফ

চতুর্থ প্রকারের এই জিহাদের নাম হল জিহাদ বিস সাইফ। অর্থাৎ আত্মরক্ষার জিহাদ। অর্থাৎ যখন শত্রু পক্ষ ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে ধর্মের উপর আক্রমণ করে সেই পরিস্থিতিতে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে যুদ্ধ করা হয় তাকে জিহাদ বিস সাইফ বলা হয় যাকে নবী করীম (সা.) ছোট জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন -

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ
عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ○ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ
دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّاۤ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا
اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ
وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ
وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ
عَزِيْزٌ ○ (الحج:40،41)

(সূরা আল হাজ্জ, ৪০-৪১)

অর্থাৎ যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে তাদেরকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হল কারণ তাদের উপর জুলুম করা হয়েছে এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান। যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি হইতে অন্যায়ভাবে শুধুমাত্র এই কারণে বহিষ্কার করা

হয়েছে যে তারা বলে, আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক। আল্লাহ্ যদি এই সকল মানুষের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহা হইলে সাধু সন্ন্যাসীগণের মঠ, গির্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদ সমূহ যাহাতে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয়, অবশ্যই ধ্বংস করে দেওয়া হত। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তার ধর্মের পথে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় শক্তিমান মহা পরাক্রমশালী।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে ইসলাম এক শান্তির ধর্ম। এবং অত্যাচার ও আক্রমণের আদেশ দেয় না, বরং শুধুমাত্র আত্মরক্ষার অনুমতি প্রদান করে আর সেটিও সেই পরিস্থিতিতে (অনুমতি প্রদান করে) যখন শত্রুপক্ষরা মুসলমানদের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। এবং কখনোই অপরের উপর চড়াও হয় নি। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে নিজেদের আত্মরক্ষার অনুমতি প্রদান করেছেন, তবেই মুসলমানরা একমাত্র নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছেন। আলেম সম্প্রদায়ের কিছু অংশ আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের কিছু শর্ত বর্ণনা করেছেন যা ব্যতিরেকে জিহাদ অবৈধ।

১) মুকাররম মুকাররম মাওলানা জাফর আলী খান সাহেব লেখেন যে, প্রথমত 'আমারত', দ্বিতীয়তঃ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা এবং তৃতীয়তঃ শত্রুপক্ষের দিকে থেকে উদ্যোগ নেওয়া।

(আখবার জামিনদার, ১৪ই জুন, ১৯৩৪)

২) মৌলবী মোহাম্মদ হোসেন বাটালবী সাহেব লেখেন, ১) মুসলমানদের মাঝে ইমাম, খলীফা বিদ্যমান থাকতে হবে। ২) মুসলমানদের মাঝে এরূপ এক ঐক্যপূর্ণ জামাত হবে যার মাঝে ইসলামের মর্যাদা হানি হওয়ার আশঙ্কা না থাকে।

(আল ইকতেসাদ, ফি মাসায়েলুল জিহাদ, পৃ: ৫১-৫২)

৩) মৌলভী নাজির হোসেন সাহেব দেহেলবী লেখেন যে, জিহাদের অনেকগুলো শর্ত রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেগুলো পূর্ণ হয়, জিহাদ হবে না।

(ফাতওয়া নাজিরিয়া, তৃতীয় খণ্ড, কিতাবুল আমারতুল জিহাদ, পৃ: ২৮২)

আলেম সম্প্রদায়ের লেখনী থেকে বোঝা যায় যে, তাদের নিকট তরবারির জিহাদের জন্য পাঁচটি শর্ত পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। এগুলির মধ্য থেকে যে কোনও একটিও যদি অপূর্ণ থাকে সে ক্ষেত্রে ধর্মীয় যুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে না। সেই শর্তগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১) একজন ইমাম হতে হবে, ২) ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। ৩) প্রয়োজন অনুসারে অস্ত্র থাকতে হবে। ৪) দেশ বা এলাকা নিজের হতে হবে ৫) উদ্যোগ শত্রুদের পক্ষ থেকে হতে হবে।

বর্তমান যুগের মুসলমান এবং তাদের আলেমগণ জিহাদের যে নারা উচ্চারণ করে এবং নিরপরাধ মানুষদের হত্যা করে অথবা হত্যা করিয়ে থাকে, তার সাথে এই জিহাদের দূরতম সম্পর্ক নেই যা পবিত্র কুরআন বর্ণনা করে। এসব যদি কুরআনী জিহাদ হত তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সফলতা প্রদান করতেন এবং বিজয় দান করতেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য যে প্রতিটি ময়দানে তাদের পরাজয় হয়েছে।

অতএব এই কথা বুঝতে হবে যে ইসলামের শান্তিপ্রিয় শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের মাঝে জিহাদের ভুল তথ্য কোথা থেকে এসেছে। এটিও ইসলামের শত্রুদের একটি ষড়যন্ত্র ছিল। শত্রুপক্ষ যখন দেখল যে, ইসলাম উন্নতি করছে এবং তারা এর প্রতিরোধে অসফল হচ্ছে। এবং অপরদিকে তারা একে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টাও করছে। সুতরাং তারা ইসলাম ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ভুল তথ্য ছড়াতে লাগল। এবং ইসলাম ধর্মের মাঝে বহু ভুল তথ্যের অবতারণা করে। মুসলমানেরাও তাদের ভুল তথ্যের শিকার হয়। সেই সব ভুল তথ্যগুলির সংশোধনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আজ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী রূপে প্রেরণ করেছেন। যিনি জিহাদের সঠিক ব্যাখ্যা বর্ণনা করে এই সব ভুল তথ্যগুলি দূরীভুত করেছেন এবং জিহাদকে রহিত করার ঘোষণা দিয়েছেন। এই ঘোষণা তিনি কখনোই নিজের পক্ষ থেকে করেন নি,বরং নবী করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে যে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদীর যুগে ধর্মীয় যুদ্ধ রহিত হবে। তিনি (সা.) বলেন- 'ইয়াযাউল হারবা' অর্থাৎ তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন।

(বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, বাব নুযুলে ঈসা ইবনে মরিয়ম)

অতএব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবিদার ছিলেন এবং নবী করীম (সা.) -এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যুদ্ধবিগ্রহের শর্তগুলি না থাকার কারণে তা রহিত হওয়ার ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন-

তিনি বলেন, হে আমার প্রিয়রা! এখন যুদ্ধের ধারণা ত্যাগ করো, কেননা, এখন ধর্মের জন্য যুদ্ধ বিগ্রহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তোমরা কেন যুদ্ধ রহিত হওয়ার কথাটিকে ভুলে যাও, তোমরা একটু খুলে দেখ তো একথা কি বুখারীতে উল্লেখ নেই?

(রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, তোহফা গোলডবিয়া, পৃ: ৭৭-৭৮)

তিনি বলেন, এতে কোনও সন্দহ নেই যে বর্তমান যুগে এই দেশে জিহাদের শর্তগুলো অসম্পূর্ণ আছে। শান্তিপূর্ণ যুগে জিহাদ অসম্ভব।

(রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, তোহফা গোলডবিয়া, পৃ: ৮২, আরবী থেকে অনুদিত)

তিনি (আ.) একথাও বলেন যে, মুমিনদের জন্য এটি অনিবার্য যে তারা যেন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যদি তারা (কুকর্ম থেকে) বিরত না থাকে।

(রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, নুরুল হক, প্রথম পর্ব, পৃ: ৬২)

যদিও বা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তরবারির জিহাদ রহিত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন, কিন্তু তার সঙ্গে এটিও বলেছেন যে, যদি জিহাদের শর্তগুলি পূর্ণ হয়, তাহলে এই জিহাদও সংঘটিত হবে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, আমাদেরকে (যারা মুসলমান) এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে শত্রুপক্ষরা যেভাবে আমাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিয়ে থাকে আমরাও যেন তাদের বিরুদ্ধে তেমনিই প্রস্তুত থাকি।

(রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৪,হাকীকাতুল মাহাদী, পৃ: ৪৫৪)

অতএব, সুধী পাঠকবৃন্দ! পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করলে আমরা বুঝতে পারি যে প্রথম পর্যায়ের জিহাদ হল সেই জিহাদ যা মানুষ নিজের আত্মার বিরুদ্ধে (কুধারণা বিরুদ্ধে) করে থাকে। এবং নিজেকে পাপ ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। এবং পুণ্যকর্ম সাধন করার ফলে আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করে নিজেকে পবিত্র এবং কর্মী রূপে গঠন করে নেয়। এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ের জিহাদের আদেশ দেওয়া হয় অর্থাৎ পবিত্র কুরআন মজীদের শিক্ষামালাকে অন্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এবং ভালবাসা ও অকাট্য প্রমাণাদির মাধ্যমে এই ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে আলোকিত করা এবং তৃতীয় পর্যায়ের জিহাদ যাকে জিহাদে আসগর বলা হয়ে থাকে এটি কেবল তখন করতে বলা হয়েছে যখন তার উপর অত্যাচার করা হয় এবং তাকে 'রাব্বুনাল্লাহ্' বলা থেকে বিরত রাখা হয়। যখন সে এই জিহাদ করে তখন আল্লাহ্ তা'লাও তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। এবং চতুর্থ পর্যায়ের জিহাদ হল জিহাদ বিল মাল অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথে ধর্মীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে আর্থিক কুরবানী করা,এবং এতে বেশি বেশি অংশগ্রহণ করা।

আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত কোনও জিহাদের ময়দানেই পিছিয়ে নেই,বরং এত এগিয়ে আছে যে অন্যরা এর ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারবে না। সেটি আত্মশুদ্ধির জিহাদ হোক,তবলীগের জিহাদ হোক, আর্থিক জিহাদ না কেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে শত্রুদের বিরোধিতা সত্ত্বেও জামাত আহমদীয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রে সফলতার পতাকাকে উড্ডীন রেখেছে এবং শত্রুরাও একথা স্বীকার করছে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা জামাত আহমদীয়াকে জিহাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। (আমীন)

মহানবী (সা.)-এর আদর্শের আলোকে জিহাদের তাৎপর্য

ফালাহুদ্দীন কমর, মুরুব্বী সিলসিলা, নাযারত উলিয়া

যেরূপে ইসলাম ধর্ম এক পরিপূর্ণ ধর্ম, অনুরূপে ইসলাম ধর্মের রসূলও হলেন পরিপূর্ণ আর এর রয়েছে পরিপূর্ণ শরিয়ত ও জীবন-বিধান যা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের পথ-প্রদর্শন করে, মানুষকে বলে দেয় তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি, তাকে শিখিয়ে দেয় জীবনযাপনের রীতি। অধিকন্ত আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর পবিত্র কর্মপন্থা ও কথনের এমন এক সুবিশাল ভাণ্ডার মুসলিম জাতির জন্য রেখে গেছেন যা কিয়ামত পর্যন্ত আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে আর তৃষ্ণার্ত আত্মাদের পরিতৃপ্ত করতে থাকবে। ইসলাম ধর্ম একদিকে যেমন জীবনের প্রতিটি আঙ্গিকের বিষয়ে বিধি-বিধান সম্পর্কে আমাদের অবগত করায়, তেমনি অপরদিকে যদি কখনও ইসলামের শত্রুদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর জোরপূর্বক যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিরোধের উপায় ও বিধানও বলে দিয়েছে। এর চিত্র আমরা আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর বরকতমণ্ডিত জীবনে দেখতে পাই। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে মোমেনদেরকে সম্বোধন করে বলেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا

'নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রসুলের মধ্যে উৎকৃষ্টতম আদর্শ রহিয়াছে, তাহার জন্য যে আল্লাহ্ এবং পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।'

(আহযাব, আয়াত: ২২)

বর্তমান যুগে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আপত্তি ও অভিযোগ আরোপের মাধ্যমে ইসলামকে আক্রমণ করা হচ্ছে। এগুলির মধ্যে একটি বড় অভিযোগ হল,ইসলামের ন্যায় শান্তিপ্রিয় ধর্মকে জিহাদের বিষয়টি নিয়ে সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে। ইসলামের শত্রুরা পৃথিবীর সামনে এমন প্রভাব সৃষ্টি করতে চাইছে যে, ইসলাম যেন সন্ত্রাসবাদের আদেশ দেয় আর এই ধর্ম পেশিশক্তির জোরে প্রসার লাভ করেছে। নাউযুবিল্লাহি। অনেকে আবার অন্ধ শত্রুতার বশবর্তী হয়ে একথা পর্যন্ত বলে বসে যে, হযরত মহম্মদ মুস্তাফা (সা.) তরবারির বলে ইসলাম প্রসার করেছেন। এই সব আপত্তি-অভিযোগের মূল কারণ প্রথমত ইসলামের শত্রুদের অন্ধ-শত্রুতা, দ্বিতীয়ত মুসলমান উলেমাদের জিহাদের অপব্যাখ্যা। অথচ বাস্তব এর সম্পূর্ণ উল্টোটি। আজ আমরা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর আশিসময় জীবন ও তাঁর দ্বারা স্থাপিত দৃষ্টান্ত সমূহ দ্বারা জিহাদের মর্মার্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করব।

স্পষ্ট থাকে যে, জিহাদ শব্দটি 'জাহাদা' থেকে উদ্গত। আর জাহাদা-র অর্থ পরিশ্রম সহ্য করা এবং জিহাদের অর্থ কোনও কাজ সম্পন্ন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা এবং চেষ্টার কোনও ত্রুটি না রাখা।

(তাজুল উরুস)

কুরআন করীম এবং হাদীসে একাধিক প্রকারের জিহাদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মূলত এটি তিন প্রকারের বলে ধরা হয়।

১)জিহাদে আকবর, অর্থাৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ বা সংগ্রাম।

২) জিহাদে কবীর অর্থাৎ কুরআনের দ্বারা জিহাদ।

৩) জিহাদে আসগর বা তরবারির জিহাদ।

জিহাদে আকবর

সৈয়্যদানা হযরত মহম্মদ (সা.)-এর ৬৩ বছরের বরকতমণ্ডিত জীবনে জিহাদে আকবরের ধারা বিস্তৃত ছিল মক্কায় হিরা গুহার নির্জন অন্ধকার থেকে মদীনার রাজকীয় বিজয় পর্যন্ত। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত জিহাদে আকবর বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামেই ব্যতীত হত। তিনি ছিলেন পরিতোষ,সাধনা, তাকওয়া, পবিত্রতা, ভ্রাতৃত্ববোধ, বিনম্রতা, সত্যবাদিতা এবং সততার পরাকাষ্ঠা, এমনকি শত্রুরাও তাঁর সত্যবাদিতা ও সততায় গুণমুগ্ধ ছিল।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, তিনি (সা.) যখন নবুয়্যতের দাবী করলেন, তখন মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে তাঁর এবং তাঁর অনুসারীদের উপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের ধারা আরম্ভ হল যা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল। প্রতিবেশীরা নিয়মিত তাঁর বাড়িতে পাথর নিক্ষেপ করত আর দরজায় কাঁটা পেতে রাখত। একবার তিনি (সা.) কাবার নিকট নামায পড়ছিলেন। এমন সময় উকবা বিন মুয়ীত হুযুর (সা.)-এর গলায় এমনভাবে কাপড় পেঁচিয়ে ধরেন যে তাঁর শ্বাস রোধ হওয়ার উপক্রম হয়। হযরত আবু বকর (রা.) সংবাদ পেয়ে দৌড়ে এসে সেই হতভাগার অনিষ্ট থেকে তাঁকে উদ্ধার করেন। একবার তিনি যখন সিজদারত অবস্থায় ছিলেন, কেউ উটের নাড়িভুড়ি এনে তাঁর পিঠে চাপিয়ে দেয়। ফলে তিনি (সা.) মাথা তুলতে পারেন নি, যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ এসে সেই নাড়িভুড়ি সরিয়ে দিয়েছে।

(সহী বুখারী, কিতাবুস সালাত)

এই সমস্ত প্রকারের অত্যাচারপূর্ণ আচরণ সত্ত্বেও হযরত মহম্মদ (সা.) ক্ষমার জিহাদের পন্থা অবলম্বন করেছেন, সব সময় মন্দের জবাব দিয়েছেন পুণ্য, দোয়া এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার মাধ্যমে। কেননা এটিই ছিল সেই মহান জিহাদ যার জন্য তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে-

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ من بعض غزواتہ فقال رجعنا من الجھاد الاصغر الی الجھاد الاکبر قال وھی مجاھدۃ النفس

অনুবাদ: একবার সৈয়্যদানা হযরত মহম্মদ মুস্তাফা (সা.) একটি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর বলেন, আমরা সকলে ছোট জিহাদ অর্থাৎ যুদ্ধ থেকে বড় জিহাদ (জিহাদে আকবর) অর্থাৎ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি।

(কুনযুল উম্মাল, কিতাবুল জিহাদ, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস-১১২৬০)

একটি রেওয়াতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন - المجاھد من جاھد نفسہ فی طاعۃ اللہ অর্থাৎ সাধনা বা সংগ্রাম সেটিই যা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের পথে মানুষকে কষ্টে নিপতিত করে।

(মিশকাত, কিতাবুল ঈমান)

এই কারণেই আঁ হযরত (সা.) প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদকেই সব থেকে বড় জিহাদ নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত এ বিষয়ের সাক্ষী প্রদান করে যে তিনি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই জিহাদের উপর নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত থেকেছেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মহম্মদ (সা.) রাতে ঘুম থেকে উঠে নামায পড়তেন। এমনকি তাঁর পা দুটি ফুলে যেত। একবার আঁ হযরত (সা.)কে আমি জিজ্ঞাসা করি হে আল্লাহ্ রসূল! আপনি কেন এত কষ্ট করেন, যখন কিনা আল্লাহ্ তা'লা আপনার পশ্চাদ -পর সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন? একথা শুনে আঁ হযরত (সা.) বললেন, আমি কি প্রতিপালকের এই কৃপা ও অনুগ্রহের জন্য তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে চাইব না?

(সহী বুখারী, কিতাবুত তফসীর, সূরা ফাতাহ)

এরপর রসুল করীম (সা.) এই জিহাদে আকবরের আরও ব্যাপক অর্থ করে গিয়ে বলেন-

عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جاھدوا المشرکین باموالکم و انفسکم والسنتکم

অর্থাৎ হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, মুশরিকদের বিরুদ্ধে নিজেদের ধন-সম্পদ, প্রাণ এবং জিহ্বা দ্বারা জিহাদ কর।

(আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ)

সৈয়্যদানা হযরত মহম্মদ (সা.) জিহাদে আকবর-এর নীচে আরও তিনটি জিহাদ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, যেরূপে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ আবশ্যক, অনুরূপভাবে ধন-সম্পদের জিহাদ

এবং জিহ্বা দ্বারা জিহাদ করাও কর্তব্য। এর উদাহরণও আমরা হাদীস থেকে পেয়ে থাকি যে কিভাবে তাঁর মান্যকারীরা ইঙ্গিত করা মাত্রই নিজেদের সব কিছু আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- হযরত যায়েদ (রা.) তাঁর পিতা আসলাম (রা.)-এর কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি উমর বিন খাত্তাব (রা.) কে একথা বলতে শুনেছি যে, একবার আঁ হযরত (সা.) আমাদেরকে কোনও এক যুদ্ধের প্রয়োজনে খোদার পথে ধন-সম্পদ ব্যায় করার আহ্বান করেন। সেই সময় আমার কাছে প্রচুর সম্পদ ছিল। আমি মনে মনে বললাম, আজ আমার কাছে হযরত আবু বাকর (রা.)-এর থেকে বেশি পুণ্য অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

তাই আমি নিজের অর্ধেক সম্পত্তি নিয়ে হুযুর (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলাম। হুযুর (সা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, উমর! কতটা সম্পদ নিয়ে এসেছ আর কতটা পরিবার ও সন্তানদের জন্য রেখে এসেছ? আমি উত্তর দিলাম, হুযুর! অর্ধেক সম্পদ নিয়ে এসেছি, অর্ধেক বাড়িতে রেখে এসেছি। আর হযরত আবু বাকর যা কিছু তাঁর কাছে ছিল তার সবটাই নিয়ে এসেছিলেন। হুযুর (সা.) হযরত আবু বাকর (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু বকর! কতটা সম্পদ নিয়ে এসেছ আর কতটা পরিবারের জন্য রেখে এসেছ। আবু বাকর উত্তর দিলেন, হুযুর ! যা কিছু আমার কাছে ছিল তার সবটাই নিয়ে এসেছি। আর স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসুলকে রেখে এসেছি। অর্থাৎ খোদার উপর নির্ভর করছি। হযরত উমর (রা.)একথা শুনে মনে মনে বললেন, আমি আবু বাকার-এর থেকে কখনোই এগিয়ে যেতে পারব না।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল মুনাকিব, ফি মুনাকিবি আবু বাকার)

সৈয়্যদানা হযরত মহম্মদ (সা.) তাঁর মান্যকারীদের কাছে একদিকে যেমন ধর্মীয় ও জাতীয় প্রয়োজনে অস্থায়ীভাবে ধন-সম্পদ কুরবানী করার আহ্বান করেছেন, অপরদিকে দরিদ্র, অনাথ, বিধবাদের জন্য ও জাতির সুখ-সমৃদ্ধির জন্য স্থায়ীভাবে যাকাত রূপে আর্থিক জিহাদের ধারা প্রবর্তন করেছেন। সম্মানীয় সাহাবাগণ এই আর্থিক কুরবানীতে পরম উৎসাহ ও উদ্যম নিয়ে অংশ গ্রহণ করতেন।

এরপর তিনি (সা.) জিহাদের অর্থকে আরও ব্যাপকতা দিতে গিয়ে বলেন-

عن ابی سعید خدری رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال :افضل الجهاد کلمة عدل عند سلطان جائر

অর্থাৎ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, সর্বোত্তম জিহাদ হল অত্যাচারী শাসকের সামনে অধিকার এবং ন্যায় বিচার দাবি করা।

(তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, বাব আফযালুল জিহাদ)

আরও একটি হাদীসে রসুল করীম (সা.) বর্ণনা করেছেন।

عن عائشة رضی الله عنها انها قالت یارسول الله تری الجهاد افضل العمل افلا نجاهد قال لکن افضل الجهاد حج مبرور

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) রসূল করীম (সা.)কে জিজ্ঞাসা করেন, হে রসূলুল্লাহ্‌! আমরা মনে করি জিহাদ সর্বোত্তম কর্মগুলির মধ্যে অন্যতম। তবে মহিলারা কেন জিহাদে অংশগ্রহণ করবে না? তিনি উত্তর দিলেন, কিন্তু সর্বোত্তম জিহাদ হল হজ্জে মবরূর।

এই সমস্ত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান, রসূল করীম (সা.) জিহাদকে জীবনের প্রতিটি অংশের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন।

জিহাদে কবীর অর্থাৎ কুরআনের মাধ্যমে জিহাদ

এখন আমি দ্বিতীয় প্রকার জিহাদ প্রসঙ্গে আসব যাকে জিহাদে কবীর বলা হয়। অর্থাৎ কুরআন-এর মাধ্যমে জিহাদ করা, সারা বিশ্বে ইসলামের প্রচার করা। আল্লাহ্‌ তা'লা কুরআন করীমে বলেন- جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا (সূরা ফুরকান, আয়াত: ৫৩)। অর্থাৎ তুমি কুরআন করীমের শিক্ষাকে অন্যদের কাছে স্নেহ, প্রেম ও যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে পৌঁছে দাও। হাদীস এবং ইতিহাসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আঁ হযরত (সা.) এই জিহাদেই নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁকে কুরআন করীমের বিধান দান করেছিলেন যা যুক্তি-প্রমাণের এমন এমন অগাধ সমুদ্র ছিল, যার আকর্ষণে শত্রুরা পর্যন্ত প্রভাবিত হয়েছে। এই কারণেই কুফফাররা পুরো মক্কাতে এই গুজব ছড়ায় যে, নাউযু বিল্লাহ্‌ মহম্মদ (সা.) একজন জাদুকর। যে কেউ তাঁর কথার প্রতি কর্ণপাত করে, তাকেই সেই জাদু মোহাচ্ছন্ন করে তোলে। হযরত উমর বিন খাত্তাব যিনি সেই সময় ইসলামের অন্যতম শত্রু ছিলেন, তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর কুরআনের এই জিহাদের পরিণামে ইসলামের বাহুপাশে আবদ্ধ হন। আর কয়েক বছরের মধ্যেই মোমেনদের ছোট্ট জামাতটি চোখের সামনে এক বিরাট দলে পরিণত হয়।

জিহাদে আসগর অর্থাৎ তরবারির জিহাদ

এবার আমি নিবন্ধের শেষ পর্বে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশের দিকে আসব। তৃতীয় প্রকার জিহাদ হল জিহাদে আসগর অর্থাৎ তরবারির জিহাদ। এর দ্বারা বিরুদ্ধবাদীরা পৃথিবীর সামনে ইসলামের এমন ভাবমূর্তি তুলে ধরছে যেন ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেছে আর এই জিহাদের অপব্যাখ্যা করেই আজকের যুগের নামধারী মুসলমান উলেমা নিরপরাধ মুসলমানদের রক্তক্ষয় করছে। বস্তুত এদের কারণেই ইসলামের ন্যায় সুন্দর ও শান্তিপ্রিয় ধর্মকে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে।

রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর আদর্শের আলোকে যদি তরবারির জিহাদ বিশ্লেষণ করে দেখি যে তিনি এর কি ব্যাখ্যা করেছেন এবং কোন পরিস্থিতিতে এটি অনিবার্য হয়ে পড়ে, আমরা দেখতে পাব যখনই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তখন তিনি এর নিয়ম-কানুন বর্ণনা করেছেন এবং মুসলিম জাতির জন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

স্পষ্ট থাকে যে, এক্ষেত্রে রসুলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর দৃষ্টান্ত ছিল অতুলনীয়। তিনি সারাটি জীবন অত্যাচারের বিনিময়ে অত্যাচার করার আদেশ দেন নি। অথচ তিনি ও তাঁর সাহাবীদের উপর নিত্যনতুন প্রকারের নির্যাতন চালানো হত। কিন্তু তিনি সব সময় তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, মক্কায় অত্যাচার ও নির্যাতনের যুগে তাঁর এক সাহাবী হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ এবং অন্য কিছু সাহাবা বলেন, হে রসুলুল্লাহ! আমরা যখন মুসলমান ছিলাম না, তখন সম্মানীয় ছিলাম, কেউ আমাদের দিকে চোখ তুলে দেখতে পারত না। এখন কুফফাররা আমাদের কাপুরুষ মনে করতে শুরু করেছে। আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিন যাতে তাদেরকে শিক্ষা দিতে পারি।'কিন্তু হযরত মহম্মদ (সা.) উত্তরে বললেন-

انی امرت بالعفو فلا تقاتلوا

অর্থাৎ আমাকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্ষমা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। তাই তোমাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিতে পারি না।

(সুনান নিসাঈ, তালখীসুস সুলাহ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫২)

আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর সম্মানীয় সাহাবাগণ অনবরত তেরো বছর দোয়া ও ধৈর্য সহকারে অত্যাচারীদের নির্যাতন সহ্য করেছেন। তাদের অত্যাচারের কারণেই তাঁকে মক্কা থেকে মদিনার দিকে হিজরত করতে হয়েছে। কিন্তু মক্কার ইসলামের শত্রুরা সেখানেও তাঁর পিছু নেয়, তাঁকে ধ্বংস করার যথাসম্ভব চেষ্টা করে। পনোরো বছর ক্রমাগত অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করার পর আল্লাহ্‌ তা'লা মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন। কেননা এখন অত্যাচারের মাত্রা সীমা অতিক্রম করেছিল।

আল্লাহ্‌ তা'লা কুরআন করীমে বলেন-

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ؕ وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ○ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ؕ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ؕ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○ (الحج:40،41)

অর্থাৎ যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে তাদেরকে (আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার) অনুমতি দেওয়া হল কারণ তাদের উপর জুলুম করা হয়েছে এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাদেরকে সাহায্য করতে পূণ ক্ষমতাবান। যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি হইতে অন্যায়ভাবে শুধুমাত্র এই কারণে বহিষ্কার করা হয়েছে যে তারা বলে, আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতিপালক। আল্লাহ্‌ যদি

এই সকল মানুষের এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহা হইলে সাধু সন্ন্যাসীগণের মঠ, গির্জ, ইহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদ সমূহ যাহাতে আল্লাহ্‌র নাম অধিক স্মরণ করা হয়, অবশ্যই ধ্বংস করে দেওয়া হত। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা তার ধর্মের পথে সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতিশয় শক্তিমান মহা পরাক্রমশালী।

(সূরা হজ্জ: ৪০-৪১)

এই কুরআনী আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে তরবারির জিহাদ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যখন কোনও জাতির উপর অত্যাচার চরমে পৌঁছে যায়, তাদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে জোর করে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাদেরকে খোদার নাম উচ্চারণের কারণে বিতাড়িত করা হয়, তখন আল্লাহ্ তা'লা আত্মরক্ষার জন্য তরবারি ধারণের অনুমতি দিয়েছেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (সা.)ও এই শর্তাবলী পালন করে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করেছেন। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তিনি এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যার ছিটেফোঁটাও আরবদের অন্যান্য যুদ্ধের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। যুদ্ধবাজ আরবরা, যারা তুচ্ছ বিষয় নিয়েও শতাব্দীর পর শতাব্দী পর্যন্ত পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থেকেছে, যুদ্ধের সময় নিহতদের দেহ বিকৃত করতে, মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করতে তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হত না। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টান্ত ছিল অনন্য সাধারণ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

اغزوبسم الله وقاتلوا فى سبيل الله ولا تغلّوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ولا امراة ولا تقتلوا اصحاب الصوامع ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلاً ولا صغيرًا ولا امراة و صلحوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين

অনুবাদ: হে মুসলমানেরা! আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বের হও আর ধর্মকে রক্ষা করার সংকল্প নিয়ে জিহাদ কর। কিন্তু সাবধান! যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ফাঁকি দিও না। কোন জাতির সঙ্গে প্রতারণা করো না। শত্রুদের মরদেহকে বিকৃত করো না শিশু , মহিলা ও ধর্ম যাজকদের বা বয়োবৃদ্ধদের হত্যা করো না। দেশের সঙ্গে চুক্তি করো, মানুষের প্রতি অনুগ্রহপূর্বক আচরণ করো, কেননা আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহকারীদের পছন্দ করেন।

(সহী মুসলিম ও আবু দাউদ)

বর্তমান যুগের নামধারী মোল্লারা জিহাদের বুলি আউড়ে নিরপরাধ মানুষদের হত্যা করছে বা অন্যদের দ্বারা হত্যা করাচ্ছে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ইসলাম, ইসলামের প্রবর্তক এবং কুরআনের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (সা.) আজ থেকে প্রায় ১৪০০ বছর পূর্বে বলেছিলেন, মুসলমানদের জন্য এমন এক যুগ আসবে যখন তাদের কর্ম ও মতবিশ্বাস বিকৃত হয়ে পড়বে, প্রবল মতভেদ দেখা দিবে। এমন অরাজকতাপূর্ণ যুগে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের সংশোধনের উদ্দেশ্যে শেষ যুগের ইমাম হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কে প্রেরণ করবেন, যিনি মুসলমানদের কর্মগত সংশোধনের পাশাপাশি বিশ্বাসগত সংশোধনও করবেন। তাঁর আগমণে যুদ্ধ রহিত হবে। তিনি (সা.) বলেছেন-يضع الحرب (তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন)

(সহী বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া)

বস্তুত এই ভবিষ্যদ্বাণীতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছিল যে, ইমাম মাহদীর যুগে জিহাদের শর্ত পূর্ণ হবে না আর সেটি হবে যুক্তি-প্রমাণ ও কলমের জিহাদের যুগ। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে বিভিন্ন প্রকারের ভ্রান্ত-বিশ্বাসের সংশোধনের জন্য হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ইমাম মাহদী করে পাঠালেন, যিনি এসে ঘোষণা দিলেন-

'আব ছোড় দো জিহাদ কা এ্যায়ে দোস্তো খায়াল,

দ্বীঁ কে লিয়ে হারাম হ্যায় আব জঙ্গ ও কিতাল'

(তোহফায়ে গোল্ডবিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ৭৭)

অর্থাৎ হে বন্ধুগণ! এখন জিহাদের চিন্তা ত্যাগ করো। ধর্মের জন্য এখন যুদ্ধ-বিগ্রহ অবৈধ।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, আজ থেকে মানুষের সেই জিহাদ যা তরবারির দ্বারা করা হত, খোদার আদেশে বন্ধ করা হল। এর পর যে কেউ কাফেরের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করে নিজেকে গাজী বলে পরিচয় দিবে, সে রসুল করীম (সা.)-এর অবাধ্যতা করল, যিনি আজ থেকে তেরোশ বছর পূর্বে বলেছেন, প্রতিশ্রুত মসীহর আগমণের সাথেই সমস্ত প্রকারের তরবারির জিহাদের অবসান ঘটবে। অতএব আমার আগমণের পরে তরবারির কোনও জিহাদ নেই। আমার পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও সন্ধির শুভ্র ধ্বজা উত্তোলন করা হয়েছে।

(খুতবা ইলহামিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ২৮)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে জিহাদের প্রকৃত তাৎপর্য ও মর্মার্থ অনুধাবন করার মাধ্যমে এর উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)!

২০-এর পাতার পর...

করে আর বিশ্বাসীদেরকে তাদের ঘর ও দেশ থেকে উৎখাত (বের করে) করে দেয় এবং বল পূর্বক তাদেরকে নিজেদের ধর্মে অন্তর্ভুক্তিকরণ করে ও ইসলাম ধর্মকে অপদস্ত করতে চায় এবং লোকদেরকে মুসলমান হতে বাধা দেয়। এরা সেই সকল লোক যাদের উপর আল্লাহতা'লার অভিসম্মাত।

وَوَجَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَن يُّحَارِبُوْهُمْ اِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا''

এবং বিশ্বাসীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য (যুদ্ধ করা) যারা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যদি তারা বিরত না হয়। (নুরুল হক ১ম খণ্ড, রুহানী খাযায়েন ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৬২)

তাঁর এই লেখনী থেকে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর নিকট তলোয়ার দ্বারা জেহাদের রসদ যখন পাওয়া যাবে তখন মোমিনদের (বিশ্বাসীদের) উপর তলোয়ারের যুদ্ধের অধ্যাদেশ বলবৎ হবে।

ইসলাম যেখানে সংশোধন ও আত্মশুদ্ধিকে জিহাদে আকবর এবং উপদেশবাণী ও ইসলাম প্রচারকে কে **জেহাদে কবীর** আখ্যায়িত করে তাকে স্থায়ী ও আবশ্যকীয় করে দিয়েছে। সেখানে তিনি তলোয়ারের যুদ্ধকে **জেহাদে সগীর** ও অস্থায়ী বা ক্ষণকালীন সংজ্ঞায়িত করে শর্তসাপেক্ষে সীমাবদ্ধ (নিয়ন্ত্রণ) করেছে। সুতরাং যেখানে সেই শর্ত পাওয়া যাবে সেখানে তলোয়ারের যুদ্ধ আবশ্যকীয় হবে এবং যেখানে শর্ত পূরণ না হবে সেক্ষেত্রে হবে না। যেহেতু মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে হিন্দুস্তানে তলোয়ারের যুদ্ধের শর্ত (রসদ) পাওয়া যেত না সেই জন্য তিনি (আঃ) তার বিরোধীতার ফতোয়া দিয়েছেন এবং সকল বিজ্ঞ উলামা তাদের আমল ও লেখনীতে যেমনটি করেছেন, উপরে প্রমাণ করা হয়েছে। তাঁর দৃষ্টি ভঙ্গি সমর্থন করেছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর থেকে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে । পূর্ব পাঞ্জাব থেকে মুসলমানদের নিঃশেষ করে দেওয়ার জন্য তাদের উপর অমুসলিমদের আক্রমণ একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র অনুযায়ী হয়েছে.....সুতরাং শত্রু নিজে যখন আক্রমণকারী আর তার উদ্দেশ্য মুসলমানদের অস্তিত্ব মুছে ফেলা এবং তাদের ধর্মকে ধ্বংস করা তাহলে এমন অত্যাচারী শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা (আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ) ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে যথার্থ জেহাদ।

ইসলামের লড়াইগুলির রীতি তিন রকমের।

: (১) আত্মরক্ষামূলক অর্থাৎ রক্ষার খাতিরে স্বেচ্ছাকৃত পদক্ষেপ। (২) শাস্তি স্বরূপ অর্থৎ খুনের বদলে খুন। (৩) স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার্থে অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতার শক্তিকে ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশ্যে যারা মুসলমান হওয়ার জন্য হত্যা করছিল। আর এই তিনটি শ্রেণীর উপর জেহাদের আভিধানিক অর্থকে দৃষ্টিপটে রেখে জেহাদ শব্দের প্রয়োগ বৈধ। কিন্তু কোন ব্যক্তিকে হত্যার ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক ধর্মে অন্তর্ভুক্তিকরণ করা অথবা শুধুমাত্র আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য আক্রমণ করার ব্যাপারে ইসলাম প্রবল বিরোধী।

****

‘ধর্মের নামে নরহত্যা’ পুস্তকের আলোকে মৌলানা মৌদুদির ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির অপনোদন

মামুন রশীদ তাবরেজ, ইতিহাস বিভাগ (কাদিয়ান)

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, শত্রুরা ইসলামের চেহারা বিকৃত করতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখে নি, তারা এটি অন্যায় ও অত্যাচারপূর্ণভাবে প্রসারিত ধর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। তাদের মতে আঁ হযরত (সা.)-এর যুদ্ধগুলি ছিল বর্বরতাপূর্ণ। কিন্তু যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করা হয় তবে প্রমাণ হয় যে, তিনি (সা.) ইসলাম প্রচারের জন্য কখনও তরবারির উপর নির্ভর করেন নি। তাঁর সমস্ত যুদ্ধই ছিল প্রতিরোধমূলক। ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে কেবল তাঁর পবিত্রকরণ শক্তি ও উচ্চ মানের চারিত্রিক গুণের কল্যাণে।

জিহাদ সম্পর্কে মৌলানা মোদুদি সাহেবের ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি

বিরোধীরা তো ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ আঁ হযরত (সা.)-এর যুদ্ধগুলিকে বর্বরতাপূর্ণ আখ্যা দিয়ে বলে ইসলাম তরবারি জোরে প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু যখন তথাকথিত কতিপয় মুসলমান উলেমাও এই ভ্রান্ত মতবাদের সমর্থন করে, তখন একে বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি বলা যায়? এদের মধ্যে এমনই একজন জামাতে ইসলামী-র আমীর মৌলানা মোদুদী সাহেবের চিন্তাধারা দেখে হৃদয় ব্যাথিত হয়। মৌলানা মোদুদি সাহেব লেখেন-

“রসুলুল্লাহ্ (সা.) ১৩ বছর পর্যন্ত আরবজাতিকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করতে থাকেন, তাদেরকে উপদেশ দিতে সবথেকে কার্যকরী পন্থাগুলি তিনি অবলম্বন করলেন। শক্তিশালী প্রমাণ পেশ করলেন, সুস্পষ্টরূপে চূড়ান্ত যুক্তি প্রতিষ্ঠা করে দেখালেন, বাগ্মিতা, রচনা ও ভাষণের উৎকর্ষতা দ্বারা তাদের হৃদয়ে গতি সঞ্চার করলেন। এমনকি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মন-মস্কিষ্ককে মোহাচ্ছন্ন করে দেওয়ার মত অলৌকিক নিদর্শনও দেখালেন, নিজের নৈতিক ও চারিত্রিক আদর্শ এবং পবিত্র জীবনে পুণ্যের সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তও তাদের সামনে স্থাপন করলেন। এমন কোনও উপায় অবশিষ্ট রাখলেন না যার দ্বারা সত্যের বহিঃপ্রকাশ হয়, প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দিবালোকের ন্যায় তাঁর সত্যাতা স্পষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সেই জাতি ইসলামের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করল। .....

উপদেশবাণী প্রচারের কাজ ব্যর্থ হওয়ার পর ইসলামের এই আহ্বায়ক হাতে তরবারি তুলে নিলেন।..... এরপর ক্রমশঃ তাদের মন থেকে পাপ ও অনিষ্টের প্রভাব দূরীভূত হতে থাকল। তাদের প্রকৃতি থেকে ক্ষতিকর উপাদানগুলি নিজে থেকেই বের হয়ে গেল, আর আত্মার কলুষতা দূর হয়ে গেল। আর তাদের চক্ষু - পর্দা অপরসাতি হয়ে কেবল সত্যের জ্যোতিই উদ্ভাসিত হল না, বরং তাদের সেই অনমনীয়তা ও দাম্ভিকতাও আর অবশিষ্ট রইল না,যা সত্য উন্মোচিত হওয়া সত্ত্বেও মানুষকে নতজানু হতে বিরত রাখে।

আরবের মত অন্যান্য আরও দেশগুলিও এত দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করল যে এক শতাব্দীতেই পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ মানুষ মুসলমান হয়ে গেল, এর কারণও এটিই ছিল যে, ইসলামের তরবারি সেই পর্দা ছিন্ন করে ফেলেছিল যা তাদের অন্তরসমূহকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।’

(আল জিহাদ ফিল ইসলাম, পৃ: ১৩৭-১৩৮)

মৌলানা মৌদুদির এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে দুঃখ প্রকাশ করে হযরত মির্যা তাহের আহমদ সাহেব খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহে.) লেখেন-

‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।’ অর্থাৎ যে জঘন্য ও বর্বর অভিযোগ ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ ঘোর শত্রুদের পক্ষ থেকে আঁ হযরত (সা.)-এর উপর আরোপ করা হত যা নিয়ে পাশ্চাত্যাবিদরা খৃষ্টান জগতে গত শতাব্দি পর্যন্ত মাতামাতি করত, আর ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে বিদ্বেষ ছড়িয়ে বেড়াত, সেই অভিযোগ আজ একজন মুসলমান নেতার পক্ষ থেকেই সেই পবিত্র রসুলের উপর চাপানো হচ্ছে, যিনি নিজেকে ‘মিযাজ শানাস রসূল’ বলে দাবি করেন। যদিও ভাষার রচনা শৈলী দ্বারা এই কল্পিত জয়গাথাকে মহিমান্বিত করে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এটি ইসলামের শত্রুদের (পাশ্চাত্যবিদদের) পক্ষ থেকে রসুল করীম (সা.)-এর বিরুদ্ধে সেই অভিযোগকেই সমর্থন করে। ইতিপূর্বে জর্জ সেল, ডোযি এবং স্মিথ যে অভিযোগ আঁ হযরত (সা.)-এর উপর আরোপ করেছিল, এটি তারই পুনরুক্তি মাত্র।”

(মযহব কে নাম পর খুন, পৃ: ২৮-২৯)

মৌলানা মৌদুদি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইসলামের জিহাদ সম্পর্কিত শিক্ষাকে একেবারেই বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিতে দেখেন নি, বরং নিজের অগভীর জ্ঞান অনুসারে অ-মুসলিমদের প্রিয় বিষয় এই ভ্রান্ত মতবাদকে শক্তি জুগিয়েছেন। এমনকি তিনি নিজের এই মতবাদের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিতও রয়েছেন। তিনি অন্যত্র বলেন-

“রসূল করীম (সা.) এবং তাঁর পশ্চাতে খুলাফায়ে রাশেদীন এই নীতিই অনুসরণ করেন। যে আরবে মুসলিম দলের উৎপত্তি হয়েছিল, সেটিকেই সর্বপ্রথম ইসলামী শাসনের অধীনে আনা হয়। এরপর রসুল করীম (সা.) আরব-সংলগ্ন দেশগুলিকে নিজের নীতি ও মতবাদের দিকে আহ্বান করেন, কিন্তু তাঁর সেই আহ্বানে তারা সাড়া দেয় কি না তিনি তার অপেক্ষা করেন নি। বরং শক্তি অর্জন হতেই রোমান-সাম্রাজের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। আঁ হযরত (সা.)-এর পর হযরত আবু বাকার (রা.) দলনেতা নির্বাচিত হলে তিনি রোম এবং পারস্য-এই দুই অ-ইসলামিক দেশের উপর আক্রমণ করেন। হযরত উমর (রা.) এই আক্রমণকে সফলতাপূর্বক লক্ষ্যে পৌঁছে দেন।”

(হাকীকতে জিহাদ, পৃ: ৬৫)

ইসলাম বিদ্বেষী কোনও শত্রুর পক্ষ থেকে এমন মন্তব্যে বিস্মিত হওয়ার কিছু ছিল না, কিন্তু পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, মৌলানা মৌদুদি সাহেব ইসলামের শত্রুদের সঙ্গে এক সারিতে সমচিন্তক হিসেবে সাব্যস্ত হলেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি ইসলামের ভ্রান্ত মতবাদকে শক্তি জুগিয়েছে। নিজের এই মতবাদকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে তিনি একথা পর্যন্ত বলেছেন যে,

“যেভাবে একথা বলা ভুল হবে যে, ইসলাম তরবারির জোরে মানুষকে মুসলমান বানিয়েছে, অনুরূপভাবে একথা বলাও ভুল হবে যে, ইসলামের প্রসারে তরবারির কোন অবদান নেই।”

(আল জিহাদু ফিল ইসলাম, পৃ: ১৩৮)

মোদ্দাকথা এই যে, মৌলানা সাহেবের মতে ইসলাম এবং তরবারি একে অপরের পরিপূরক। তাঁর চিন্তা ও চেতনায় এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছে যে ইসলাম তরবারির জোরেই প্রসার লাভ করেছে।

মৌলানা মৌদুদির ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির অপনোদন

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) তাঁর প্রণীত ‘মাযহাব কে নাম পর খুন’ পুস্তকে আমাদের জন্য আঁ হযরত (সা.)-এর জীবনীকে আলোকবর্তিকা অভিহিত করে মৌলানা সাহেবের এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন-

“ মক্কা বিজয় পর্যন্ত হযরত রসূল করীম (সা.)-এর জীবনকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম যুগ সেই নিদারুন অত্যাচার ও নির্যাতনের যুগ যার সময়কাল ছিল নবুয়্যতের দাবি থেকে হিজরত পর্যন্ত। এটিকে সাধারণ পরিচিত শব্দে ‘মক্কী যুগ’ বলা হয়। দ্বিতীয় হল মদীনার সেই

যুগ যা হিজরী সাল থেকে হুদাইবিয়া সন্ধি পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কাল। এই যুগটিকেও প্রবল অত্যাচারের যুগ হিসেবে স্মরণ করা হয়, কেননা, যদিও মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা শত্রুদের সামনে সংখ্যাবল কিম্বা যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম -কোন বিষয়েই দাঁড়াতে পারত না। পুরো আরব ভূ-খণ্ডে শুধুমাত্র মদীনাতেই মুসলমানদের জনপদ গড়ে উঠেছিল, আর এই একমাত্র জনপদেও তাদের একাধিপত্য ছিল না। ইহুদিদের তিনটি সম্ভ্রান্ত গোত্র এর বিরাট অংশ দখল করে ছিল। এমনকি অউস এবং খাযরাজ গোত্রের সমস্ত সদস্য ইসলাম গ্রহণ করে নি। তাদের উপমা ছিল সেই ক্ষীণবল শিশুর ন্যায় যাকে এমন এক বলিষ্ঠ পালোয়ানের বিপরীতে প্রতিরোধের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যে স্বর্ণ-বর্ম পরিহিত হাতে বর্শা ও কোমরে তরবারি নিয়ে এক হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে এসেছে। কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী শিশুটি যুদ্ধে বের হয়েছে নগ্ন পায়ে, অর্ধ-বসনে একটি ডগাহীন তরবারি নিয়ে। এই গুটিকতক মুসলমানের তুলনায় সমগ্র আরবের শক্তি তো অনেক বেশি ছিল। কেবল বদরের যুদ্ধে আক্রমণকারী শত্রু ও প্রতিরোধকারী মুসলমান সেনাবাহিনীর যদি তুলনা করা হয়, তবে ঠিক এই চিত্রই সামনে আসবে। কাজেই সেই যুগটিকেও নির্যাতনের যুগ বলেই চিহ্নিত করব, যদিও একথা স্বীকার করছি যে প্রতিরোধ করার অনুমতি ছিল।

তৃতীয় যুগ হল হুদায়বিয়া সন্ধি থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত। এটি ছিল শান্তি ও মীমাংসার যুগ। এই সময়ে মুসলমানদের উপর মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে কোনও আক্রমণ হয় নি। তথাপি ইহুদী এবং অন্যান্য কিছু গোত্রের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের পরিণামে কয়েকটি যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হয়েছে।

হিজরত থেকে হুদাইবিয়ার সন্ধি

দ্বিতীয় যুগে মুসলমানেরা নিজেদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু হয়তো অসৎ ধারণা প্রবণ অনেকে বলতে পারে যে, এই প্রতিরোধমূলক তরবারির ভয়েই ইসলামের প্রসার ঘটেছে। কিন্তু সেই যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের প্রতি অগভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও এই সংশয় সেভাবেই দূরীভূত হয় যেভাবে সূর্যোদয়ের ফলে রাতের অন্ধকার বিদুরীত হয়। সেই যুগে মদীনায় আনসার নামে পরিচিত মুসলমানদের প্রায় সিংহভাগই ছিল অউস এবং খাযরাজ গোত্রের। এছাড়া ইহুদীদের মধ্য থেকে কিছু ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিল আর কিছু সংখ্যক মুসলমান ছিল মদীনার বাইরের অন্যান্য জনপদ থেকে আসা। মক্কাতেও পুরোপুরিভাবে ইসলামের প্রচলন হতে পারে নি, আর মক্কার কাফেরদের ভীষণ নির্যাতন সত্ত্বেও সেখানে ইসলাম গ্রহণের ধারা অব্যাহত ছিল।

এই মদীনার যুগের মুসলমানদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল আনসারদের দল। কোনও বল প্রয়োগ ও চাপ সৃষ্টি ছাড়াই আনসারদের ইসলাম গ্রহণ করাও এমন এক সুস্পষ্ট সত্য যে, শত্রুরা পর্যন্ত বলতে পারে না আনসাররা মুহাজিরদের তরবারির ভয়ে মুসলমান হয়েছিল বা তাদের ইসলাম গ্রহণের নেপথ্যে তরবারির সামান্যতম ভূমিকাও ছিল। আঁ হযরত (সা.) অউস এবং খাযরাজ গোত্রের সঙ্গে প্রথম থেকেই কোনও যুদ্ধ করেন নি। কাজেই তরবারির জোরে মুসলমান বানানোর প্রশ্ন ওঠে না। ইহুদীদের মধ্যে থেকে মুসলমান হওয়ার সংখ্যা খুব কম ছিল আর তাদের মধ্যেও কারো সম্পর্কে এমনটি সন্দেহ করার অবকাশ নেই যে তারা তরবারি ভয়ে মুসলমান হয়েছিল, বরং তারা এমন প্রবল বিরোধীতাপূর্ণ ও বিপজ্জনক পরিবেশে মুসলমান হয়েছিল, যখন কিনা মুসলমানদের ভবিষ্যতও বাহ্যতঃ বিপন্ন বলে প্রতিভাত হচ্ছিল। বাইরের গোত্রগুলির নব-মুসলিমরাও কোনওক্রমেই তরবারির ভয়ে মুসলমান হয় নি, যাদের সংখ্যা আনসারদের তুলনায় নগণ্য ছিল। তারাও অত্যন্ত বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

এবার আসা যাক সে যুগের যুদ্ধ ও সেনা অভিযান প্রসঙ্গে। এগুলির পরিণামে তরবারির ভয়ে মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা কেবল তাদেরই যারা যুদ্ধ-বন্দী ছিল। এই বিষয়টির গভীর অনুসন্ধান করার জন্য জরুরী হিজরত থেকে হুদাইবিয়া-সন্ধি পর্যন্ত সমস্ত যুদ্ধ ও সেনা অভিযানগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখা, যা ছিল মোট ৫০টি।

'গাযওয়া' বা সারিয়া'-কে (উভয় শব্দ যুদ্ধের অর্থে ব্যবহৃত হয়) অনেকে অজ্ঞানতা বশত যুদ্ধ বলে বোঝেন। 'গাযওয়া' বলতে সেই সমস্ত অভিযানকে বোঝানো হয় যেগুলিতে রসুল করীম (সা.) স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেছেন। যেমন যুদ্ধ, চোর-ডাকাতদের পিছু ধাওয়া করা কিম্বা তদারকির জন্য কোনও দল বাইরে যাচ্ছে সেই সময় সঙ্গে থাকা। অনুরূপভাবে 'সারিয়া' বলতেও সেনা বা যুদ্ধাভিযানকেই বোঝায়, পার্থক্য কেবল এতটুকু যে সারিয়া'তে রসুল করীম (সা.) অংশ গ্রহণ করেন নি। এছাড়াও অনেক প্রচারভিযানও 'গাযওয়া' ও 'সারিয়া'-র অন্তর্ভুক্ত। আবার কোনও সাহাবীর ব্যক্তিগত অভিযানকেও সারিয়া বলা হয়। যাইহোক সেই যুগে মোট পঞ্চাশটি 'গাযওয়া' ও 'সারিয়া' সংঘটিত হয়েছিল, যেগুলির মধ্যে কেবল তিনটিকে যুদ্ধ বলা যথাযথ হবে। ওহদের যুদ্ধ, বদরের যুদ্ধ এবং আহযাবের যুদ্ধ। এই পঞ্চাশটির মধ্যে ৪২টি-তে কেউ যুদ্ধ-বন্দী হয়ে আসে নি। আর যে ৮টি অভিযানে কিছু সেনাকে যুদ্ধ-বন্দী করে নিয়ে আসা হয়েছিল তাদের মধ্যে বদরের যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য। এই যুদ্ধে মোট ৭২জনকে বন্দী করা হয়েছিল। যাদের মধ্যে ২জনকে পুরোনো অপরাধের শাস্তি হিসেবে হত্যা করা হয়েছিল। বাকীদের মুক্তিপণের বিনিময়ে রেহাই দেওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে অনেকে মুক্তিপণ হিসেবে আনসারদের বাচ্চাদের লেখা শিখিয়েছিল। ওহদের যুদ্ধে কোনও শত্রু বন্দী হয় নি, আহযাবের যুদ্ধেও না। বনু মুসতালিক-এর যুদ্ধে একশর বেশি পুরুষ ও মহিলা যুদ্ধ-বন্দী হয়ে এসেছিল। কিন্তু সকলকে মুক্তিপণ ছাড়াই নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও আরও কয়েকটি অভিযানে দু-একজন ইহুদী বন্দী হয়ে এসেছে যাদেরকে মুক্তিপণ বা কোনও শর্ত ছাড়াই রেহাই দেওয়া হয়েছে। এই গুলি সেই সব সত্য যা স্বয়ং মৌলানা মৌদুদিও অস্বীকার করতে পারবে না।

কিন্তু আমি বলছি, যদি একথাও স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, এই সব যুদ্ধ-বন্দীদেরকে তরবারির ভয় দেখিয়ে মুসলমান বানানো হয়েছিল, সেক্ষেত্রেও তাদের সংখ্যা এতই নগণ্য ঠেকবে যা আনসার ও মুহাজিরদের সামনে কোনও মূল্যই রাখে না। আর এর ভিত্তিতে সেই উপসংহারে পৌছাঁনো যায় না যেখানে মৌলানা মৌদুদি পৌঁছেছেন । এটি তার কাছে শোভনীয় নয়। এমন কথাবার্তা সেই সব বিদ্বেষপরায়ণ ইসলামের শত্রুদের শোভা পায় যারা নিজেদের অন্তর্দহনে দিশেহারা হয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর উপর অভিযোগ আরোপের জন্য খড়কুটোর আশ্রয় নেয়।

তৃতীয় যুগ- হুদাইবিয়া সন্ধি থেকে মক্কা বিজয়

এই যুগে সংঘটিত 'গাযওয়া' ও 'সারিয়া' অভিযানের সংখ্যা ২২টি। যেগুলির মধ্যে তিনটিতে যুদ্ধ-বন্দী হাতে আসে। এক, সারিয়া হাসমা, (জামাদিয়াল সানি, ৭ম হিজরী) যেখানে হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রা.) হুনায়েদ দস্যু ও তার সাথীদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে বন্দী বানিয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু তাদেরকে প্রায়ঃশ্চিত্ত করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে মুক্তি দেওয়া হয়। এছাড়াও বনু কিলাব ও বশীর বিন সাআদ আনসারী-র অভিযানে হাতে গোনা কয়েকজন বন্দী হয়, কিন্তু এদের সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না।

কাজে্ই এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, হিজরত থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত একজন বন্দীকেও তরবারির জোরে মুসলমান বানানোর ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না, না তাদের সম্পর্কে একথা বলা যেতে পারে যে, তরবারি তাদের অন্তরের কলুষতা দূর

শেষাংশ ৩৬ পাতায়

সম্পাদকীয়র শেষাংশ.....

এবং ফ্রান্সের দূতাবাসের রাজনৈতিক আধিকারিকবর্গ, বিভিন্ন সরকারি প্রতিনিধি, বিভিন্ন ধর্ম, চার্চ এবং সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি এবং এমনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যাল-এর প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। হুযুর আনোয়ারের আগমণে হল্যাণ্ডের পত্রিকা (Ons Almere) তাদের ২৫ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখের সংখ্যায় নিম্নরূপ শিরোনাম দেয়।

'শান্তির খলীফা হল্যাণ্ডে আগমণ করেছেন।'

এই সংবাদ প্রকাশিত হয়: খলীফাতুল মসীহ সমগ্র বিশ্বে মানবীয় সহানুভুতি নিয়ে খোদার সৃষ্টজীবের সেবা করছেন। তিনি শান্তি ও ধর্মীয় সহনশীলতা রপ্রসার করছেন। খলীফা পৃথিবীর অন্যান্য পার্লামেন্ট ছাড়াও ডাচ পার্লামেন্টেও ভাষণ দান করেছেন।

যুগের প্রয়োজনীয়তা এবং পরিস্থিতি অনুসারে তিনি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহে যে কাজ করা তৌফিক পেয়েছেন, সেক্ষেত্রে তিনি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। এই কারণে আমরাই কেবল নিজেদের বই-পুস্তক, পত্রিকা এবং সংবাদ-পত্রিকা তাঁকে কেবল শান্তির দূত বলেই উল্লেখ করি না, বরং অন্যরাও অকপটে একথা স্বীকার করতে আরম্ভ করেছে যে, পৃথিবীতে শান্তি ও সৌহার্দ্যের প্রসারে এই ব্যক্তির কোনও তুলনা নেই। বিগত যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় ২১ অক্টোবর ২০১৮ সালে হুযুর বিমানে করে ওয়াশিংটন থেকে হিউস্টন যাওয়ার জন্য পরিকল্পনা করেন। ১২:৪৫টায় তিনি বিমাননন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। ইউনাইটেড এয়ার লাইন-এর বরিষ্ঠ কর্মীরাকে তাঁকে স্বাগত জানান। হুযুর আনোয়ার বিশেষ লউঞ্জে আসেন। বেলা ২টার সময় বিমান বোর্ডিং হয়। ২:৩৫ টায় ইউনাইটেড এয়ারলাইনের বিমান ইউ.এ ৪৮৪ ওয়াশিংটন এর ডালাস এয়ারপোর্ট থেকে হিউস্টনের জর্জ বুশ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। বিমানের যাত্রা শুরুর কিছুক্ষণ পর পাইলট কেবিন থেকে ঘোষণা করা হয়-

'হযরত মির্যা মসরূর আহমদ আমাদের বিমানে যাত্রা করছেন। আমরা তাঁকে স্বাগত জানাই..... হুযুর আনোয়ার শান্তির বিশ্ব-দূত। তিনি পৃথিবীতে ধর্মীয় স্বাধীনতা, সহিষ্ণুতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টারত রয়েছেন।"

(৩১শে জানুয়ারী, ২০১৯-এর বদর সংখ্যায় পৃ: ১০, অনুচ্ছেদ-১০ দ্রষ্টব্য)

পৃথিবীর বিভিন্ন পার্লামেন্টে হুযুর আনোয়ার ইসলামের শান্তিদায়ক শিক্ষার উপর যে ভাষণ দিয়েছেন সেগুলির মধ্যে কয়েকটি উদ্ধৃতি এবং ভাষণের উপর অতিতিদের প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন করা হচ্ছে।

২২ শে অক্টোবর ২০০৮ সালে হুযুর আনোয়ার বিট্রিশ পার্লামেন্টে ভাষণ প্রদান করেন। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ থেকে আগত ত্রিশ জনের অধিক সাংসদ এবং সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিত্বকারী দূতাবাস এবং বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণ তাঁর ভাষণ শোনার জন্য সমবেত হয়েছিলেন।

ভাষণ:হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের জীবনের একমাত্র এবং মহান উদ্দেশ্য হল পৃথিবীর সামনে আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র আদর্শ এবং ইসলামে অনিন্দ সুন্দর শিক্ষাকে উপস্থাপন করা।

তিনি বলেন, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের শিক্ষা হল ন্যায়-নীতি থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয়ো না, এমনকি শত্রুদের প্রতি ন্যায়বিচার কর। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগের ইতিহাস থেকে স্পষ্ট হয় যে এই শিক্ষা অনুশীলনের মাধ্যমে ন্যায় বিচারের সমস্ত আনুষঙ্গিকতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করা হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, রসুল করীম (সা.) মক্কা বিজয়ের পর মোটেই তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি, যারা মুসলমানদের উপর ঘোর নির্যাতন চালিয়েছিল। তিনি যে তাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন, শুধু এতটুকুই নয়, বরং তাদেরকে নিজের নিজের ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকারও অনুমতি দিলেন।

প্রতিক্রিয়া:লোকাল গভর্নমেন্ট ফর কমিউনিটি শ্রীমতি মাননীয়া ব্লেয়ার্স, সেক্রেটারী অফ স্টেট বলেন: আমি একথা অকপটে স্বীকার করতে পারি যে, এই ভাষণ আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। রাজনীতিবিদদের এই ধরণের ভাষণের নজির অত্যন্ত বিরল। এমন প্রভাব বিস্তারকারী বক্তৃতা খুব কমই শোনা যায়।

২৭ শে জুন, ২০১২ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিস-র ক্যাপিটাল হিল (সংসদ ভবন)-এ হুযুর আনোয়ার শীর্ষ স্থানীয় কংগ্রেস সদস্য, সিনেটর,রাষ্ট্রদূত, হোয়াইট হাউস ও স্টেট ডিপার্টমেনেটর কর্মকতা, এন.জি.ও. নেতা, ধর্মীয় নেতা, অধ্যাপক, নীতি নির্ধারক, আমলা, কূটনীতিবিদ, বিভিন্ন থিংক ট্যাংক ও পেন্টাগন-এর প্রতিনিধি এবং মিডিয়ার পক্ষ থেকে উপস্থিত সাংবাদিকগণ-এর উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করেন। ভাষণের পূর্বে হুযুর আনোয়ারকে ওয়াশিংটন ডিসি-তে স্বাগত জানিয়ে এবং বিশ্ব শান্তি, অহিংসতা, মানবাধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ চেষ্টার স্বীকৃতি জানিয়ে একটি রেজুলেশন পাস হয়, যার কিছু অংশ এখানে উপস্থাপন করা হল।

এই রেজুলেশন স্বীকৃতি জানাচ্ছে যে, হুযুর আনোয়ার শান্তির সপক্ষে একজন সক্রিয় শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতা যিনি তাঁর খুতবা, বক্তৃতা, বই ও ব্যক্তিগত সাক্ষাতে মানব সেবা, সার্বজনীন মানবাধিকার, এবং একটি শান্তিপূর্ণ ও ন্যায্য সমাজ সংক্রান্ত আহমদীয়া মূল্যবোধসমূহের প্রসারে অবিরাম চেষ্টায় রত আছেন।

* হুযুর আনোয়ার সেবার পথকে প্রশস্ত করতে বিশ্ব জুড়ে সফর করে রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন।

হুযুর আনোয়ারকে ওয়াশিংটন ডিসি-র ক্যাপিটাল হিলে স্বাগত জানানো হচ্ছে। ব্যক্তিগত ও বিশ্ব শান্তি এবং ব্যক্তিগত বিশ্ব পর্যায়ে ন্যায় এর প্রসারের জন্য এবং আহমদী মুসলমানদের সর্বদা, এমনকি, নিপীড়নের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও সহিংসতা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দানে ধৈর্যের জন্য তাঁর প্রশংসা করে।

ভাষণ:হুযুর আনোয়ার বলেন: কোরআন স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে,সকল মানুষ জন্মগতভাবে সমান। উপরন্তু, মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর শেষ ভাষণে সকল মুসলমানকে চিরকাল এ কথা স্মরণ রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, একজন আরববাসী একজন অনারবের তুলনায়শ্রেষ্ঠ নয়, আবার একজন অনারবও একজন আরবের উপর কোন ধরনেরশ্রেষ্ঠত্ব রাখে না। তিনি আরো বলেছেন, একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ একজন কৃষ্ণাঙ্গের তুলনায় কোন প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব রাখে না এবং একজন কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিও একজন শ্বেতাঙ্গের তুলনায় শ্রেষ্ঠ নয়। অতএব সকল জাতি ও সকল বর্ণের মানুষ সমান-এটিই ইসলামের সুস্পষ্ট শিক্ষা। আর একথাও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, সকল মানুষকে বৈষম্য ও পক্ষপাতহীনভাবে সমঅধিকার প্রদান করা উচিত। এটিই হচ্ছে বিভিন্ন দল ও জাতির মাঝে সম্প্রীতি এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল পন্থা ও অপরিহার্য সূত্র।

ইসলাম ধর্ম সকল ক্ষেত্রে নিখাদ ন্যায় প্রতিষ্ঠার ও সাম্যের শিক্ষা দেয়। আমরা পবিত্র কোরআনের ৫নম্বর সূরার ৩ নম্বর আয়াতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দেখতে পাই। এই আয়াতে বলা হয়েছে, ন্যায়ের দাবী সমুন্নত রাখতে হলে এমন লোকদের সাথেও ন্যায্য ও সাম্যের আচরণ করা আবশ্যক, যারা ঘৃণ্য ও শত্রুতা প্রদর্শনে সকল সীমা অতিক্রম করে। আর পবিত্র কোরআনের শিক্ষা হল, যেখানে যে-ই তোমাদের কল্যাণ ও পুণ্যের দিকে আহ্বান করে তোমাদের তা গ্রহণ করা উচিত। আর যে-ই যে ক্ষেত্রে পাপ ও অন্যায় করতে তোমাদের পরামর্শ দেয়, তোমাদের তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন দাঁড়ায় ইসলাম যে ন্যায় পরায়ণতার কথা বলে, এর মানদন্ড কী? পবিত্র কোরআনের ৪নম্বর সূরার ১৩৬নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, কাউকে যদি তার নিজের বিরুদ্ধে বা তার পিতা-মাতার বিরুদ্ধে বা তার সবচেয়ে প্রিয় কারও বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিতে হয়, ন্যায়-নীতি এবং সত্যকে সমুন্নত রাখার জন্য তার এ কাজ করা উচিত।

ইসলাম আমাদের মনোযোগ শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় উপকরণের প্রতি আকর্ষণ করে। এজন্য চাই অকৃত্রিম ন্যায়পরায়ণতা। এর জন্য সব সময় সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা অপরিহার্য। আমরা যেন অন্য কারও সম্পদের প্রতি লোভের দৃষ্টিতে না তাকাই, এটি হল এর দাবি। উন্নত দেশগুলো তাদের স্বার্থসিদ্ধির সেবার চেতনা ও প্রেরণা নিয়ে অনুন্নত ও দরিদ্র জাতিসমূহের সাহায্য ও সেবা করবে, এটিই এর দাবি। এসব দিক যদি মেনে চলা হয় কেবল তবেই সত্যিকারের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

প্রতিক্রিয়া: কংগ্রেস সদস্য কেইথ এলিসন বলেন, হুযুর আনোয়ারের ভাষণ শুনে যারপরনায় প্রভাবিত হয়েছি। শান্তি ও ন্যায়ের বিষয়ে হুযুর আনোয়ার যেভাবে ধর্মীয় শিক্ষামালা উপস্থাপন করেছেন তা অভূতপূর্ব ছিল। তাঁর ভাষণটি প্রকাশ করে ব্যাপকহারে বিতরণ করা উচিত। মুসলিম জাতির ভীষণভাবে প্রয়োজন আজ হুযুরের ন্যায় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আধ্যাত্মিক মুসলিম নেতার আর বিভিন্ন দলে বিভক্ত মুসলমানদের জন্য হুযুর আনোয়ারের সত্তা আশিসপূর্ণ। কুরআন করীমের শিক্ষা অনুসারে কাউকে কোনও ধর্মে দীক্ষিত করার বিষয়ে কোনও জবর-দস্তি নেই আর সকল মুসলমানদের কর্তব্য ইসলামের সঠিক শিক্ষামালা অনুধাবন করা।

২০১২ সালের ৩রা ও ৪ঠা ডিসেম্বর নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান এবং মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর ৫ম খলিফা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ খামিস (আইঃ) ব্রাসেল্‌স-এ অবস্থিত ইউরোপীয় পার্লামেন্টে প্রথমবারের মত সফর করেন, যেখানে ৩০টি দেশের প্রতিনিধিত্বকারী সাড়ে তিন শতাধিক অতিথির ভরা সমাবেশে এক ঐতিহাসিক বক্তৃতা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিল ডঃ চার্লস ট্যানক (এম.ই.পি-যুক্তরাজ্য)-এর সভাপতিত্বে নব গঠিত সর্বদলীয় ইউরোপীয় পার্লামেন্ট গ্রুপ "ফ্রেন্ডস্ অফ আহ্‌মদীয়া"। এটি এম.ই.পি-দের একটি সর্বদলীয় এবং সর্ব-ইউরোপীয় গ্রুপ যা ইউরোপীয় পার্লামেন্টে আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়কে তুলে ধরা এবং ইউরোপ ও বাকি বিশ্বে তাদের পক্ষে কাজ করার উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে। সফরকালে হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ (আইঃ)-বেশ কয়েকবার পার্লামেন্ট ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

ভাষণ: ইসলামের অন্যতম মৌলিক ও প্রাথমিক একটি শিক্ষা এই যে একজন প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি যার কথা ও কাজ থেকে অপর সকল শান্তিকামী মানুষ নিরাপদ থাকে। এটি একজন মুসলমানের সেই সংজ্ঞা যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রদান করেছেন। এ মৌলিক ও অনুপম সুন্দর নীতি শোনার পরে ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ বা আপত্তি উত্থাপনের আর কোন আবশ্যক থাকে কি? নিশ্চয় না। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, কেবলমাত্র যারা নিজ কথা ও কাজে অন্যায় ও বিদ্বেষ ছড়ায় তারাই শাস্তি প্রদানের যোগ্য। এভাবে, স্থানীয় পর্যায় থেকে বৈশ্বিক পর্যায় যদি সকল পক্ষ এ স্বর্ণালী নীতির গন্ডির মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা দেখবো যে, কখনো ধর্মীয় বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হবে না। কখনো রাজনৈতিক অস্থিরতার উদ্ভব হবে না আর লালসা ও ক্ষমতালিপ্সা থেকে উদ্ভূত বিশৃঙ্খলাও সৃষ্টি হবে না। অন্যের প্রতি কোন অন্যায়-অবিচার বা তাদের কোন অধিকার হরণ হলে আমাদের তা সহ্য করা উচিত না। ঠিক যেভাবে আমরা আমাদের নিজেদের অধিকারের হরণ মেনে নিই না, অন্যদের ক্ষেত্রেও এটি আমাদের মেনে নিতে প্রস্তুত থাকা উচিত না। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, যখন প্রতিশোধ গ্রহণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে তখন তা প্রথম সীমালংঘনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। কিন্তু, যদি ক্ষমা প্রদর্শনের ফলে সংশোধনের অবকাশ থাকে তবে ক্ষমার পথটি বেছে নেওয়া উচিত। প্রকৃত এবং সবচেয়ে অগ্রগণ্য উদ্দেশ্য সব সময় হওয়া উচিত সংশোধন, সমঝোতা ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা।

আর একটি সুন্দর নীতি যা ইসলাম শেখায় তা এই যে, সমাজে শান্তির জন্য সততা ও ন্যায় বিচারের নীতির উপর ক্রোধকে প্রাধান্য লাভের সুযোগ না দিয়ে প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক একে দমন করা। ইসলামের সূচনা লগ্নের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, প্রকৃত মুসলমানগণ সদা এ নীতির উপর চলেছেন; আর যে কেউ তা করেন নি তিনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কর্তৃক তিরস্কৃত হয়েছেন। ইসলাম এ শিক্ষা দেয় যে, অন্যের ধন-সম্পদের দিকে ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে দেখা উচিত না, কেননা এটিও শান্তিকে বিপন্ন করে তোলে।

প্রতিক্রিয়া: বিশপ ডক্টর আমীন হাওয়ার্ড হুযুরের ভাষণ শুনতে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা থেকে এসেছিলেন। তিনি ইন্টার ফেথ ইন্টারন্যাশনাল -এর প্রতিনিধি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ফীড ও ফ্যামিলি-এর সংস্থাপক ও সদর। তিনি বলেন, 'এই ব্যক্তি জাদুকর নন, কিন্তু তাঁর কথাগুলি মন্ত্রের মত প্রভাব রাখে। ধীর-স্থির ভঙ্গি, কিন্তু তার মুখ-নিঃসৃত কথার মধ্যে অপরিমেয় শক্তি, বৈভব ও প্রভাব অনুভুত হয়েছে। এমন দুঃসাহসী মানুষ আমি নিজের জীবনে কখনও দেখি নি। পৃথিবীতে তাঁর মত ব্যক্তি যদি কেবল তিন জন পাওয়া যায়, তবে কয়েক মাস নয় বরং কয়েক দিনেই সার্বজনীন শান্তির ক্ষেত্রে পৃথিবীতে এক অসাধারণ বিপ্লব সাধিত হওয়া সম্ভব আর এই পৃথিবী হয়ে উঠবে শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধের স্বর্গ। আমি অবশ্য ইসলাম সম্পর্কে মোটেই সুধারণা পোষণ করতাম না।কিন্তু হুযুরের ভাষণ ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারণাকে আমূল পাল্টে দিয়েছে।

২০১৩ সালের ৪ঠা নভেম্বর হুযুর আনোয়ার (আই.) নিউজিল্যান্ডের পার্লামেন্টে ভাষণ প্রদান করেন। পার্লামেন্ট সদস্য কমলজীত বক্সী হুযুর আনোয়ারকে পার্লামেন্টকে পার্লামেন্টে স্বাগত জানান। হুযুর আনোয়ার (আই.) বক্তব্যের প্রারম্ভে বলেন, আমি সেই বিষয়ের উপর আলোকপাত করব যা আমার দৃষ্টিতে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ, তা হল বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা। হুযুর আনোয়ার পৃথিবীর সংকটময় পরিস্থিতি এবং পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে বলেন,

"দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে দেশগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে 'জাতিসংঘ' নামে একটি সংগঠন তৈরী করে। যাইহোক, যেভাবে লিগ অব নেশনস নিজের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল, অনুরূপভাবে জাতি সংঘও ক্রমশঃ নিজ উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে মর্যাদা হারিয়ে ফেলছে। যদি ন্যায়বিচারের দাবি পূরণ না করা হয়, তবে শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে যত সংগঠনই তৈরী করা হোকনা কেন তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পৃথিবীতে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধাবলী থেকে রক্ষা কল্পে সমস্ত দেশ সম্মিলিতভাবে একটি সংগঠন তৈরী করে যেটিকে 'রাষ্ট্রসংঘ' বলা হয়। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন যেভাবে লীগ অফ নেশন নিজের উদ্দেশ্য পুরণে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে, অনুরূপভাবে আজ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সম্মান ও প্রতিষ্ঠাও ক্রমশঃ অধঃপতিত হচ্ছে।

শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কুরআনী শিক্ষা সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, "এইভাবে কোরআন মজীদ শিক্ষা দেয় যে, যতদূর সম্ভব পারস্পরিক আলোচনা ও বোঝাপড়ার পথ খোলা রেখে সকল প্রকারের শত্রুতা ও বিদ্বেষের নিষ্পত্তি করা উচিত। নিশ্চিতরূপে নম্রতা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আচরণ হৃদয়ে সদর্থক প্রভাব সৃষ্টি করে, যা ঘৃণা ও বিদ্বেষের অবসান ঘটায়।"

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, "একজন বিশ্বব্যাপী ইসলামি জামাতের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে আমার নৈতিক দায়িত্ব হল, শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে পৃথিবীর মনোযোগ আকর্ষণ করা। এটি আমি নিজের কর্তব্য বলে মনে করি। কেননা, ইসলামের অর্থই হল শান্তি ও নিরাপত্তা। যদি মুষ্টিমেয় ইসলামি দেশ সহিংসতা ও অরাজকতাপূর্ণ কার্যকলাপ চালিয়ে যায় কিম্বা এর পৃষ্ঠপোষকতা করে, তবে তার অর্থ এই দাঁড়ায় না যে, ইসলামি শিক্ষা নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলাকে সমর্থন করে। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মহম্মদ (সাঃ) তাঁর মান্যকারীদেরকে সব সময় 'সালাম' দেওয়ার শিক্ষা প্রদান করেছেন, যার অর্থ হল শান্তির বাণীর প্রসার করা। আমরা তাঁর আদর্শ থেকে জানতে পারি যে, তিনি সবসময় ইহুদী, খৃষ্টান নির্বিশেষে সকল ধর্মের অনুসারী নিজের প্রতিবেশীদেরকে

'সালাম' করতেন। কারণ তিনি জানতেন যে, সমগ্র মানবজাতি আল্লাহ্ তা'লারই সৃষ্ট এবং আল্লাহ্ তা'লার অপর একটি নাম হল 'সালাম' বা শান্তির উৎস। তাই তিনি সমগ্র মানবজাতির জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা কামনা করতেন।

প্রতিক্রিয়া: পার্লামেন্ট সদস্য কমলজিত সিং বক্সী বলেন, " বিগত দশ বছর থেকে জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক রয়েছে। আমি দেখেছি এই জামাতের মূখ্য উদ্দেশ্য হল শান্তি এবং আন্তর্জাতিক স্তরে জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্যের পথকে মসৃণ করা।

ইজরাইলের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ লিভনে বলেন, "আমার মতে খলীফাতুল মসীহ পৃথিবীকে যে বার্তা দিয়েছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, প্রত্যেকের উচিত এই বাণীকে গ্রহণ করা। তাঁর এই বার্তা বাস্তব রূপ ধারণ করুক, এটিই আমার বাসনা। যত দ্রুত এটি হয় ততই মঙ্গল।

পার্লামেন্ট সদস্য রাজেন প্রসাদ বলেন, " আহমদীরা যেমন শান্তিপূর্ণভাবে এদেশের নাগরিক হিসেবে বাস করছে এবং নিজেদের শান্তির বার্তাকে বাস্তবায়িত করে চলেছে তা সবসময় আমার মনে বিস্ময় জাগায়।

ডেপুটি হাই কমিশনার প্যাট্রিক রেলি বলেন, "যে বার্তা শোনার সুযোগ আমাদের হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বার্তা সারা বিশ্বে প্রসার লাভ করা দরকার।

হল্যান্ডের জাতী সংসদে হুযুর আনোয়ার ২১০৫ সালের ৬ অক্টোবর ভাষণ দান করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, "বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তা আমাদের যুগের বড় জটিল একটি সমস্যার রূপ নিয়েছে। সুতরাং আমরা আহ্মদীরা সে সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত নই যারা আজকের বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির জন্য দায়ী। বরং আমরা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্টা করতে চাই। আমরা বিশ্বের নিরাময় এবং বিশ্ব মানবতাকে সংঘবদ্ধ করতে চাই। আমরা সকল ঘৃণা আর শত্রুতাকে ভালোবাসা আর স্নেহে বদলে দিতে চাই। আর নিশ্চিতভাবেই আমরা এমন জাতি যারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সব কিছু উজাড় করে দিতে চাই।" হুযুর আনোয়ার বলেন, "এটি চরম অন্যায় কথা যে,বিশ্বের কিছু নেতা এবং সাধারণ মানুষ কোরআন এবং ইসলামের রসূল (সাঃ)-কে সহিংসতা ও নিষ্ঠুরতার সাথে সম্পৃক্ত করে। আপনি যদি কোরআন এবং রসূলে করীম (সাঃ)-র জীবনাদর্শকে নিরপেক্ষভাবে পাঠ করেন তাহলে দেখবেন যে, ইসলাম সকল প্রকার উগ্রতা এবং রক্তপাতের বিরোধী। সময়ের স্বল্পতার দরুন বিস্তারিত আলোচনায় হয়তো যেতে পারবো না। কিন্তু আমি কয়েকটি মৌলিক ইসলামি শিক্ষা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো। যা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করবে যে, ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম।" এরপর হুযুর আনোয়ার শান্তি প্রসঙ্গে ইসলামের শিক্ষামালা বর্ণনা করেন।

ফরেন অ্যাফেয়ার কমিটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হ্যারি ভ্যান বমিল, যিনি অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন, তিনি বলেন, "আমার অনুমানের চাইতে অনুষ্ঠান অনেক বেশি সফল হয়েছে, এর পরিণাম হবে সুদূরপ্রসারী। খলীফাতুল মসীহ নিজের বার্তা অত্যন্ত প্রভাবী ভঙ্গিতে দান দিয়েছেন। ইসলামের শান্তিপ্রিয় চেহারাটি দেখার অধিকার হল্যান্ডের মানুষেরও রয়েছে। তাদের এই বাণীর প্রয়োজন রয়েছে। খলীফাতুল মসীহর সঙ্গে পার্লামেন্টের এই অনুষ্ঠান প্রথম পদক্ষেপ ছিল। আমরা এই ধরণের আরও অনুষ্ঠানের আয়োজন করব।

হল্যাণ্ডের সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডক্টর ডব্লিউ এফ ভ্যান ইকিলিন বলেন- খলীফাতুল মসীহর বার্তার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত রূপ দেখার সুযোগ হল। আমার ইচ্ছে, হুযুর আনোয়ার হল্যাণ্ডে আসুন, যাতে মানুষের মন থেকে ইসলাম-ভীতি দূর হয়।

মোন্টি নেগরুর পার্লামেন্ট সদস্য Mr Dritan Abazovic বলেন: জামাতের বিশ্ব-নেতা খলীফা দ্বারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সর্বোচ্চ স্তরে উপস্থাপিত হওয়া অনেক বড় সফলতা হিসেবে গণ্য হবে। বর্তমান যুগের এই বিপদসংকুল পরিস্থিতিতে এমন অনুষ্ঠানের ভীষণ প্রয়োজন রয়েছে।

সুইজার ল্যান্ড থেকে বিশপ ডক্টর আমান হাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জেনেভার স্যাংচারি প্রেয ইন্টারন্যাশনাল চার্চ-এর বিশপ। তিনি বলেন, "আমার বিশ্বাস, তিনি প্রকৃতপক্ষেই শান্তির দূত। আমি চাই, সমস্ত মুসলমান বিশ্ব-স্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রচেষ্টার শরীক হোক।

ক্রোয়েশিয়ার শাসক দল সোসাল ডেমোক্রেট-এর এক পার্লামেন্ট সদস্য প্যান্ডেক ড্রাযেনকো বলেন- খলীফাতুল মসীহ ইসলামী শিক্ষাকে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং প্রভাবী ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের শিক্ষা কার্যকরী। যদি সমস্ত মুসলমান এই শিক্ষামালা সত্যনিষ্ঠভাবে মেনে চলে, তবে পৃথিবী শান্তি নিবাসে পরিণত হবে।

সুইডেনের পার্লামেন্ট সদস্য মি. বেঙ্গট এলিয়াসন বলেন, " হুযুর আনোয়ারের ভাষণ আমাকে যারপরনায় প্রভাবিত করেছে। তাঁর বক্তব্য ছিল সত্যের পরাকাষ্ঠা। কোনও বিষয় তিনি গোপন রাখেন নি। শান্তি, ন্যায়, সহনশীলতা, মানবতা, ভালবাসা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে তাঁর ভাষণ অত্যন্ত সহজবোধ্য ভাষায় মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং পৃথিবীকে একটি বার্তা দিয়েছে।

কানাডিয়ান পার্লামেন্টে হুযুর বক্তব্য রাখেন ২০১৬ সালের ১৭ অক্টোবর। শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে ইসলামী শিক্ষামালা এবং আরও অনেক বিষয়ের উপর তিনি আলোকপাত করেন। এখানে কেবল কতিপয় ব্যক্তিবর্গের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হল যাতে অনুমান করা যায় যে তাঁর ভাষণ কীরূপ সমাদৃত হয়েছিল।

ইজরাইলের রাষ্ট্রদূত রাফায়েল বারাক নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন: অভূতপূর্ব প্রভাবশালী বক্তব্য ছিল। শান্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তা ছিল এবং কিভাবে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান বজায় রাখতে হয় সেই দৃষ্টিকোণ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারণা আজ পাল্টে গেছে, এর প্রতি শ্রদ্ধাও বেড়ে গেছে অনেকখানি। বক্তব্যটি প্রকাশ করা উচিত এবং মানুষের মাঝে ব্যাপকহারে প্রচার করা উচিত। এই বার্তা অনুসৃত হলে পৃথিবীর ভয়াবহ সমস্যাগুলিরও নিরসন হওয়া সম্ভব। তাঁর বক্তব্যে সহনশীলতা ও মানবাধিকার প্রসঙ্গে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। মুসলমান হোক বা ইহুদী-প্রত্যেকের অধিকার রক্ষিত হওয়া বিধেয়। তাঁর বার্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবসৃষ্টিকারী ছিল।

চীফ ইমাম ও স্কলার মহম্মদ জিবারা বলেন: আমি একজন সুন্নী ইমাম। একথা বলতে আমার কোনও দ্বিধা নেই যে, এই ভাষণ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত রচনা করেছে। এটি আজকের দিনের সব থেকে বড় প্রয়োজন। খলীফার বক্তব্য প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং সময়োপযোগী ছিল। তিনি অত্যন্ত দূরদর্শী ও সমভাবাপন্ন চিন্তাধারার অধিকারী। তিনি বলেছেন ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভারসাম্য থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিকে অত্যন্ত চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন, অনেক জটিল দিকগুলিকেও এমন চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন যাতে মানুষের ভাবাবেগ আহত নয়।

পার্লামেন্ট সদস্য নিকোলো ডি ওরিও বলেন: হুযুরের ব্যক্তিত্ব নিখুঁত ও তাঁর কথাগুলি ছিল ভীষণভাবে কার্যকরী। তাঁর অপূর্ব সুন্দর বক্তব্যে সমগ্র জগতের সমস্যাবলীর সমাধান সংক্ষিপ্ত রূপে তুলে ধরা হয়েছিল। জামাত আহমদীয়া এক অসাধারণ জামাত যা অন্যান্য ধর্মীয় সংগঠনগুলির জন্য একক অনন্য দৃষ্টান্ত। আমি বিস্মিত হয়েছি এই কারণে যে, আমার ধারণা ছিল হুযুর ধন্যবাদজ্ঞাপনমূলক কয়েকটি কথা বলে বসে পড়বেন, কিন্তু যে বক্তব্য তিনি রাখলেন, তার থেকে ভাল কোনও বক্তব্য জীবনে কখনও শুনেছি বলে মনে হয় না। আজ পৃথিবী যে সমস্ত সংকটের সম্মুখীন সে সব কিছুর উপরেই তিনি আলোকপাত করেছেন। আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং শান্তির দূতের কথা শুনে আমি ভীষণ আনন্দিত হয়েছি। তিনি প্রায় একার বলে সমগ্র জগতকে ইসলাম সম্পর্কে পরিচিত করছেন।

আল্লাহ্ করুন পৃথিবীবাসী যথাশীঘ্র ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হোক। (আমীন)

[মনসুর আহমদ মসরূর, সম্পাদক- বদর পত্রিকা (উর্দু)]

৬ পাতার শেষাংশ...

উপাসনাগার ভূলুণ্ঠিত করার মত এমন সংকীর্ণতা, হঠকারিতা এবং বিদ্বেষ ইসলাম পছন্দ করে না। মুসলমানেরা, আটশো বছর, হাজার বছর আবার কোথাও এগারো শ বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছে। এই দেশের উপাসনাগারগুলি আজও অক্ষত রয়েছে, ধ্বংস করা হয় নি। কিন্তু নবজাগরণের পথিকৃত জাতিকে জিজ্ঞাসা কর পাড়ামোর মন্দির কোথায় ছিল? তারা এর উত্তর দিতে পারবে না। চিহ্ন পর্যন্ত মুছে দিয়েছে, এমনকি বাইবেলে যে যেরুসালেমকে পবিত্র স্থান বলে মনে করা হয়েছিল, সেই স্থানকে পর্যন্ত শূকর বধ দ্বারা অপবিত্র করে দেওয়া হয়েছে। হয়তো কেউ দাবি করতে পারে যে শূকর অপবিত্র নয়। কিন্তু বাইবেল পাঠ করলে দেখবে ঠিক এর উল্টোটি রয়েছে।

অপরদিকে স্পেন ও প্যালেস্টাইনে কিরূপ বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য ছিল। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখ, প্রাচীন থেকে প্রাচীনতম উপাসনাগারকেও স্পর্শ করা হয় নি। বরং হযরত ফারুকের যুগে যখন তিনি যেরুসালেম আসেন, তখন সেখানকার বিশপ বলেছিলেন, 'এখানে নামায পড়ে নাও। তিনি বললেন, তুমি অত্যন্ত অপরিণামদর্শী। আমি যদি এখানে নামায পড়ি, তবে মুসলমানেরা এটিকে মসজিদ বানিয়ে ফেলবে। আমাদের নবী (সা.)-এর কাছে নাজরানের খৃষ্টানেরা যেদিনটিতে এসেছিল, সেই দিনটি ছিল রবিবার।তিনি (সা.) তাদেরকে বলেছিলেন, আমার এই মসজিদকে গীর্জা মনে কর। সেই লোকগুলি সম্ভবত রোমান ক্যাথলিক ছিল। তিনি (সা.) তাদেরকে উৎসাহের সাথে অনুমতি দিয়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, যেখানে তিনি সকলের প্রতি অনুগ্রহ করতেন, তেমনি ধর্মকে রক্ষা করাও ছিল তাঁর ধর্ম। ভারতে প্রথম হিজরী শতাব্দীতে আরবরা এসেছিল আর তারা কমপক্ষে সাড়ে এগারোশ বছর পর্যন্ত ইসলামি শাসন ছিল। এই সুদীর্ঘকালে ভারতের উপাসনাগারগুলির উপর ইসলামী শাসন ব্যবস্থার কি কোনও প্রভাব ছিল? এগুলির উপস্থিতিই বাস্তবতাকে উজাগর করছে।

(হাকায়েকুল ফুরকান, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৪-১৫৭)

৭ পাতার শেষাংশ..

ঘটতে থাকে।

(খুতবাতে তাহের, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৭৮, প্রদত্ত খুতবা জুমা ১লা মার্চ, ১৯৯১)

প্রকৃত, প্রাথমিক এবং শ্রেষ্ঠ জিহাদ হল নিজের প্রভুপ্রতিপালকের দিকে মানবজাতিকে আহ্বান করা।

اُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ○ (النحل:126)

(নহল, আয়াত: ১২৬)

যে আয়াতটি আমি তিলাওয়াত করেছি, এতে আল্লাহ্ তা'লার পথে জিহাদের বিষয় বর্ণিত হয়েছে, যা প্রকৃত, প্রাথমিক এবং শ্রেষ্ঠ জিহাদ। অর্থৎ নিজ প্রভুপ্রতিপালকের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা। এই জিহাদ কিভাবে করা হবে, কোন কোন অস্ত্র দ্বারা করা হবে? এ সম্পর্কে এই আয়াত ঘোষণা দেয়, **'উদউ ইলা সাবীলি রাব্বিকা'** নিজ প্রভুপ্রতিপালকের পথে মানুষকে প্রজ্ঞাসহকারে আহ্বান কর; তরবারি বা তীরের দ্বারা নয়, চমক-ধমক দিয়ে নয়,বরং প্রজ্ঞাসহকারে ডাক। **'ওয়াল মাউইযাতিল হাসানাতি'** এবং সদুপদেশ ও মনোহর উপদেশের মাধ্যমে। **'ওয়া জাদিলহুম বিল্লাতি হিয়া আহসানু'** -আর পরিশেষে যুদ্ধ যদি করতেই হয়, তবে সর্বোত্তম উপায়ে যুদ্ধ কর, সর্বোৎকৃষ্ট দলিল অবলম্বন কর। উত্তমরূপে অর্থাৎ চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে সেই দলিলগুলি উপস্থাপন কর, কেননা উদ্দেশ্য হল মন জয় করা, মানুষকে পরাজিত করা নয়। অতএব এটি সেই প্রাথমিক এবং প্রকৃত জিহাদ যার দিকে কুরআন করীম প্রত্যেক মোমেনকে আহ্বান করে। আর এই জিহাদের নিয়ম অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, সেই অস্ত্রগুলি সম্পর্কেও বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যেগুলি জিহাদে ব্যবহৃত হবে।

(খুতবাতে তাহের, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৮৬৯, প্রদত্ত খুতবা জুমা ৮ নভেম্বর, ১৯৯১)

৮পাতার শেষাংশ..

মুহম্মদ স্বয়ং মহম্মদ (সা.)-এর প্রমাণ

অনুরূপভাবে এটিও এক সত্য যে, (যেরূপ আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায়) কুরআন করীমের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা কুরআনের জ্যোতি ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। তাই নিজের হৃদয়ে কুরআনের জ্যোতিকে ধারণ করে সেই জ্যোতি নিয়ে পৃথিবীর সংশোধনের জন্য বের হতে হবে এবং কুরআনের প্রসার করতে হবে। এটি হল দ্বিতীয় প্রকারের জিহাদ। অর্থাৎ কুরআনের জ্যোতির মাধ্যমে আত্ম-সংশোধন করা।

তৃতীয় প্রকারের জিহাদ হল শয়তান যখন খাপ থেকে তরবারি বের করে জাগতিক শক্তিকে সঙ্গে নিয়ে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে পদদলিত করার চেষ্টা করে, তখন খোদার সাহায্য নিয়ে দোয়ার মাধ্যমে এবং তাঁর কৃপাসহকারে সেই তরবারিকে ভেঙ্গে ফেলা এবং ব্যর্থ করে দেওয়া। এটি সর্বাপেক্ষা লঘু জিহাদ। এই কারণেই এটিকে 'জিহাদে আসগর' বা ছোট জিহাদ বলা হয়।

..... অতএব খোদা তা'লা আমাদেরকে জিহাদের আদেশ দিয়েছেন। জিহাদ আমাদের এবং আমাদের সমাজ-জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। জিহাদের আদেশের প্রেক্ষিতে খোদা তা'লা আমাদেরকে কেবল চেষ্টা ও পরিশ্রম করার আদেশই দেন নি, বরং আপ্রাণ চেষ্টা এবং পরিশ্রম করার আদেশ দিয়েছেন। যদি কোনও ব্যক্তি নিজের চেষ্টা ও পরিশ্রমকে চূড়ান্ত পর্যায়ে না নিয়ে যায়, তবে তার জিহাদ নিরর্থক। আমাদের প্রতিটি পুণ্য কর্মের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা এবং সাধনা যদি পরম বিন্দুতে উপনীত হয়, তবে ইসলামের পরিভাষায় সেটিই জিহাদ হতে পারে। অর্থাৎ ঐশী সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হতে পারে। কিন্তু আমাদের কোনও কর্মের মধ্যে যদি অলসতা ও উদাসীনতা কিম্বা তাতে অবহেলার কোনও উপাদান থাকে, আর আমাদেরকে যে কেবল পরিশ্রম ও সাধনা করার আদেশই দেওয়া হয়নি, বরং চূড়ান্ত পরিশ্রমের আদেশ দেওয়া হয়েছে, এই কথাটি যদি মাথায় না থাকে, তবে সেটি ইসলামি জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে না।

(খুতবাতে নাসের, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৯৫, প্রদত্ত খুতবা ২১ শে জুলাই, ১৯৭২)

৯ পাতার শেষাংশ..

প্রান্তে পৌঁছে যাবে। এর বিপরীতে বাহ্যিক যুদ্ধের পরিণাম খুব সীমিত ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই স্পষ্ট আয়াত সামনে থাকতেও পাশ্চাত্যের মানুষেরা এই আপত্তি করে আসছে যে, মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) যুদ্ধ দ্বারা শত্রুদের পরাস্ত করেছেন। যদি মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর বিজয়সমূহ যুদ্ধের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকত তবে কুরআন করীম এটিকে ইঙ্গিতে কেন ছোট জিহাদ বলল আর কুরআন সহকারে যুদ্ধকে বড় যুদ্ধ বলল? কুরআন একথা কেন বলল যে جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا। হে মহম্মদ রসুলুল্লাহ্! তোমার প্রকৃত যুদ্ধ হবে কুরআন করীমের অস্ত্র নিয়ে। তুমি এই অস্ত্র নিয়ে শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এটিই বৃহত যুদ্ধ।

বিচিত্র বিষয় হল এই আয়াতে যে দুটি জিহাদের সংবাদ দেওয়া হয়েছে, একটি তরবারির জিহাদ যা ক্ষুদ্রতর জিহাদ হবে আর অপরপক্ষে বড় জিহাদটি হবে যুক্তি-প্রমাণ ও দলিলের জিহাদ। এটি সূরা ফুরকানের আয়াত যেটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ রসুলুল্লাহ্ (সা.) সেই সময় মক্কাতেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে না ছিল কোনও সৈন্যবাহিনীও, না ছিল কোনও দেশ, যার জন্য খোদা তা'লা তাঁকে বলেছেন যে তোমাকে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হবে। সেই যুদ্ধ হবে কিছু তরবারির আর কিছুটা যুক্তি-প্রমাণের। যুক্তি-প্রমাণ ও দলিলের যুদ্ধ বড় হবে আর তরবারির যুদ্ধ ছোট। রসুলুল্লাহ্ (সা.) স্বয়ং এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন। একবার এক জিহাদ থেকে ফিরে আসার পর তিনি বলেন- رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ (রুদ্দুল মুখতার আলাদ দারেল মুখতার, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৫) আমরা ছোট যুদ্ধ থেকে বড় যুদ্ধের দিকে প্রত্যাবর্তন করছি। অর্থাৎ আমরা যেন যুক্তি-প্রমাণের যুদ্ধ ও কুরআন করীমের প্রসারের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করি। কাজেই রসুলুল্লাহ্ (সা.)ও যুক্তিপ্রমাণ ও দলিলের যুদ্ধকে বড় লড়াই এবং তরবারির যুদ্ধকে ছোট যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন।

৩১ পাতার পর...

করেছিল, এবং পরে তাদেরকে ইসলামের রঙে রঙীন করা হয়েছে। কেননা, বাস্তবে তাদেরকে সেই শিরক্‌ময় অপবিত্র জগতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে কি এখন মৌলানা মৌদুদি সাহেব একথার উত্তর দিবেন যে, ঐ মানুষগুলি কারা ছিল, রসুল করীম (সা.) যাদেরকে নিজের সমস্ত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির ব্যর্থতার পর তরবারির জৌলুস দেখিয়ে মুসলমান বানিয়েছিলেন? নাউযুবিল্লাহ। কবেই বা তাদের জন্ম হয়েছিল? তারা কোথাকার বাসিন্দা ছিল? কোথা থেকে এসেছিল আর কোথায় বা হারিয়ে গেল? নাকি তাদেরকে পৃথিবী গিলে ফেলল বা আকাশ খেয়ে ফেলল? তাদের অস্তিত্ব যদি মৌলানা সাহেবের কল্পনাপ্রসূত হয়, আর অবশ্যই তা কল্পনাপ্রসূত, তবে কেন তিনি আদম-সন্তানদের সর্দার (সা.)-এর উপর এমন গুরুতর ও ভিত্তিহীন অভিযোগ আরোপ থেকে বিরত হন না? যদি আঁ হযরত (সা.) ধর্মে বল-প্রয়োগে বিশ্বাসী হতেন, তবে কি তিনি পারতেন না সেই সব অসহায় বন্দীদেরকে ছুরির ডগায় মুসলমান বানিয়ে ফেলতে?"

(মাযহাব কে নাম পর খুন, পৃ: ৬০-৬৫)

সুধী পাঠকবর্গ! ইসলাম কখনোই ধর্মের নামে বল-প্রয়োগকে প্রশয় দেয় না। সব সময় لَآ اِكۡرَاهَ فِى الدِّيۡنِ- এর ধ্বনি উচ্চকিত করে এসেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল আমাদের মুসলিম নেতারাই ইসলামী শিক্ষার মর্মার্থ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তারা ইসলামী শিক্ষার বিপরীতে এমন সব বিষয়ের অবতারণা করে যা ইসলামের শত্রুদের দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তি জোগায়। এর মূল কারণ তারা যুগের ইমামকে সনাক্ত করেনি, উল্টো তাঁর বিরোধীতাই করে এসেছে।

وَمَنۡ كَانَ فِىۡ هٰذِهٖۤ اَعۡمٰى فَهُوَ فِى الۡاٰخِرَةِ اَعۡمٰى এই জগতেও তারা অন্ধ হয়ে থাকল আর পরকালেও তাদের অনুরূপ অবস্থা হবে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদেরকে সুমতি দিন, তারা যেন নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে যুগের ইমামকে সনাক্তকারী হয়। আমীন।

বদর পত্রিকা সংরক্ষণ করুন

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগের স্মারক 'বদর পত্রিকা' ১৯৫২ সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাদিয়ান দারুল আমান থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের ধর্মীয় চাহিদা পূরণ করে চলেছে। এতে কুরআনের আয়াত, মহানবী (সা.)-এর হাদীস, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মালফুযাত ও লেখনী ছাড়াও সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাম্প্রতিক খুতবা ও ভাষণ, বার্তা, প্রশ্নোত্তর আকারে খুতবা জুমা, হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সফরের ধর্মীয় ও জাগতিক জ্ঞান সমৃদ্ধ ঈমান উদ্দীপক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে থাকে। এর অধ্যায়ন করা, অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং এর মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা করা আমাদের সকলের কর্তব্য। এই সমস্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য বদর পত্রিকার প্রত্যেকটি সংখ্যা যত্ন করে নিজের কাছে রেখে দেওয়া আমাদের সকলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা সম্বলিত এই পবিত্র পত্রিকা সম্মানের দাবি রাখে। অতএব এটিকে বাতিল কাগজ হিসেবে বিক্রি করা এর সম্মানকে পদদলিত করার নামান্তর। যত্ন করে রাখা যদি সম্ভব না হয়, তবে সেগুলিকে অতি সাবধানে নষ্ট করে দিন যাতে এই পবিত্র লেখনী গুলির অসম্মান না হয়। আশা করা যায়, জামাতের সদস্যবর্গ এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিবেন এবং এর থেকে যথাসম্ভব উপকৃত হওয়ার মাধ্যমে বিষয়টিকে দৃষ্টিপটে রাখবেন।

(সম্পাদকীয়)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond harbour

১০ পাতার পর...

মানে এটি তাদের দুর্ভাগ্য। কুরআন নিঃসন্দেহে মূলরূপে তাদের কাছে সংরক্ষিত আছে কিন্তু এর উপর তাদর কোনও আমল নেই, তারা এটি মেনে চলে না। কুরআন এবং কুরআনী শিক্ষার যেভাবে হিফাযত বা সুরক্ষা করা উচিত সেই হিফাযতের দায়িত্ব তারা পালন করছে না। এর সুরক্ষার দায়িত্ব হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এবং তাঁর জামাতকেই পালন করতে হবে। জ্ঞান এবং কর্মগুণের মাধ্যমে আমাদেরকেই পৃথিবীবাসীকে অবহিত করতে হবে, পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা ইসলামের পক্ষ থেকে হুমকির সম্মুখীন নয় বরং তাদের পক্ষ থেকে হুমকীর সম্মুখীন যারা এর বিরুদ্ধে চলছে।

এরা যে ইসলামকে দুর্নাম করে, আসলে তারা মিথ্যা ও অপবাদ আরোপ করছে। সত্যিকার অর্থে তাদের এই মিথ্যা ও অপবাদ আরোপ পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলছে। এরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, পৃথিবীতে ভৌগলিক এবং রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নৈরাজ্য সৃষ্টি করে রেখেছে। মুসলমান দেশে যেসব নৈরাজ্য বিরাজ করছে সেখানেও কিছু পরাশক্তির হাত রয়েছে। এখন পাশ্চাত্যের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে তাদের আপনজনরাই বলছে, মুসলমান দেশের এই উগ্রপন্থী দলগুলো আমাদের সরকারেরই সৃষ্ট যা আমরা ইরাক যুদ্ধের পর বা সিরিয়ার পরিস্থিতির পর সৃষ্টি করেছি। এই কথা বলে আমি মুসলমান এবং যারা মুসলমান বলে আখ্যায়িত হয়ে উগ্রতা এবং ইসলামী শিক্ষার ভ্রান্ত চিত্র তুলে ধরছে তাদেরকে দায়মুক্ত আখ্যায়িত করছি না, কিন্তু এই অগ্নি প্রজ্জলিত করার ক্ষেত্রে পরাশক্তিগুলির অবশ্যই হাত রয়েছে। এ সব কিছু বড় কারণ হল সুবিচার না করা।

(খুতবা জুমা প্রদত্ত, ১১ই ডিসেম্বর, ২০১৫)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেছেন:

" আমি আপনাদেরকে শুভ সংবাদ দিচ্ছি যে, এরপর আহমদীয়া খিলাফত কখনও ভয়ংকর বিপদে পড়বে না ইনশাআল্লাহ্ । আহমদীয়া জামাত এখন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সাবালক হয়েছে। শত্রুর কোন দৃষ্টি, শত্রুর কোন অন্তর, শত্রুর কোন চেষ্টা এ জামাতের চুলও বাঁকা করতে পারবে না। আহমদীয়া খিলাফত ইনশাআল্লাহ্ ঐ সমস্ত শান-শওকত মান-মর্যাদা নিয়েই বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করতে থাকবে। যে শান-শওকতের প্রতিশ্রুত আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে দিয়েছেন। কমপক্ষে একহাজার বছ র পর্যন্ত এ জামাত জীবিত থাকবে। সুতরাং দোয়া করতে এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসার গীত গাইতে থাকুন। এবং নিজেদের (বয়আতের) প্রতিজ্ঞার নবায়ন করুন।

(আল ফযল, ২৮শে জুন, ১৯৮২, লন্ডন আল ফযল ইন্ট্যার ন্যাশনাল, ১৩ জুন, ২০০৩)

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) তাঁর প্রথম জুমআর খুতবায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ করে শোনান।

" আমি বড় দাবী ও দৃঢ়তার সাথে বলছি, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এ ক্ষেত্রে আমারই বিজয় অবধারিত। যতদূর আমি আমার দূরদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখেছি সমস্ত পৃথিবীকে আমি আমার পদতলে সমর্পিত দেখেছি। আর নিকট ভবিষ্যতে আমি এক মহান বিজয় লাভ করতে যাচ্ছি। কেননা আমার কথার সমর্থনে আরেকজন কথা বলছে...."

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্ তা'লা খিলাফত এবং জামাতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারীদের পথ-প্রদর্শন করেন।

-খুতবা জমা ২৪ মে ২০১৯

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)